অধ্যায় ৩ মানব শারীরতত্ত্ব: পরিপাক ও শোষণ
(HUMAN PHYSIOLOGY: DIGESTION AND ABSORPTION)

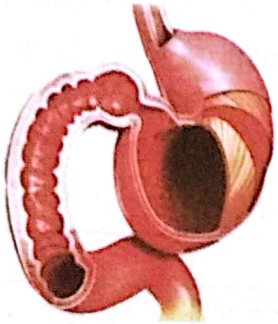

প্রাকৃতিক উৎসজাত যেসব কঠিন বা তরল বস্তু আহার বা পান করলে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, কর্মশক্তি সৃষ্টি, তাপ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাদের খাদ্য বলে। খাদ্য মানবদেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে এবং স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখে। খাদ্যের অভাবে যেমন পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ দেখা দেয় তেমনি অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ শরীরে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে মানুষের পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক এবং দেহের স্থূলতা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words) : ❑ পরিপাক ❑ শোষণ ❑ যকৃত ❑ অগ্ন্যাশয় ❑ গ্যাস্ট্রিন ❑ সিকাম ❑ আন্ত্রিক রস ❑ খাদ্যসার শোষণ ❑ জৈব রসায়নাগার ❑ স্থূলতা

পিরিয়ড সংখ্যা ৭। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে	
শিখনফল	**বিষয়বস্তু**
১। মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২। পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘঠিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩। যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫। গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬। খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭। ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন হতে রক্তনালিকা ও ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮। বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯। ব্যবহারিক: পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ১০। স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখ গহ্বরে খাদ্য পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘঠিত পরিপাক ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ: ○ যকৃত ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য দ্রব্যের ○ পরিপাক ○ শোষণ ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● ব্যবহারিক: যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ● স্থূলতা ○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতিরোধ।

৩.১ খাদ্য পরিপাক ও শোষণ

পরিপাক (Digestion)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে ভক্ষণকৃত জটিল, অদ্রবণীয় ও কঠিন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় সরল, দ্রবণীয় ও তরল খাদ্যসারে পরিণত হয়ে শোষণ ও আত্তীকরণের উপযোগী উপাদানে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বা হজম (digestion) বলে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

মানুষ সর্বভুক প্রাণী। এদের খাদ্য তালিকায় আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি- এ 6 ধরনের খাদ্যই অন্তর্ভুক্ত। ভিটামিন, পানি ও খনিজ লবণ কোষ কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হয় বলে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল বিধায় এগুলোকে পরিপাকের প্রয়োজন হয়। উপরোক্ত 6 ধরনের খাদ্যোপাদান সমৃদ্ধ যেসব খাদ্য মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি সরবরাহ করে তাকে আদর্শ খাদ্য বা সুষম খাদ্য (balanced diet) বলে। খাদ্যে মানুষ অধিকাংশ খাদ্যকে সিদ্ধ অবস্থায় খেয়ে থাকে। কারণ মানুষের পরিপাকতন্ত্র কাঁচা খাদ্য হজমের উপযোগী নয়।

খাদ্যের প্রাত্যহিক চাহিদা

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের নিম্নলিখিত হারে দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক:

খাদ্যের নাম	পরিমাণ	শারীরবৃত্তীয় কাজ
১। শর্করা	450-600 গ্রাম	কোষের বিপাকীয় কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন করা।
২। আমিষ	100-150 গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ, হরমোন ও এনজাইম উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করা।
৩। স্নেহ	45-50 গ্রাম	কোষ আবরণীর প্রবেশ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা। কোষ আবরণীর গাঠনিক উপাদান সৃষ্টি করা। দেহের ভবিষ্যত ব্যবহার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করা।
৪। ভিটামিন	5500-5600 মিগ্রা	দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও অনাক্রম্যতায় সহায়তা করা।
৫। খনিজলবণ	8-10 গ্রাম	দাঁত, অস্থি, কলা, রক্ত, পেশি ও স্নায়ুকোষের গাঠনিক উপাদান তৈরি করা। কোষ-কলা পুনরুৎপাদন করা।
৬। পানি	2-3 লিটার	বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক অণুর সার্বজনীন দ্রাবক; দেহ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।.

একজন সুস্থ মানুষের দেহে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হতে 24 থেকে 72 ঘণ্টা সময় লাগে। মানবদেহে অতি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত চর্বিযুক্ত খাবার হজম হতে সময় লাগে 6 ঘণ্টা কিন্তু শর্করা জাতীয় খাদ্য হজম হতে সময় লাগে মাত্র 2 ঘণ্টা। খাদ্য পরিপাকের শারীরতত্ত্ব বিভিন্ন মানুষ ধরন এবং খাদ্যের আকার ও ধরনের উপর নির্ভর করে।

মানুষের বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্য পরিপাক নিম্নলিখিত 6 টি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১। খাদ্য ও তরল পদার্থের সঞ্চালন,
২। দেহ নিঃসৃত বিভিন্ন পদার্থের সাথে খাদ্যের মিশ্রণ,
৩। জটিল প্রোটিন, লিপিড ও শর্করা খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ,
৪। বিভিন্ন তরল বিশেষ করে পানির পুনঃশোষণ,
৫। মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন- ভিটামিন K এবং বায়োটিন উৎপাদন এবং
৬। বর্জ্য পদার্থের বহিষ্কার।

ভাত, রুটি, আলু, চিনি প্রভৃতি শর্করা খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন শর্করা বিশ্লেষী (amylolytic) এনজাইম দ্বারা জটিল শর্করা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল গ্লুকোজ অণু গঠন করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সব্জি, ফল প্রভৃতি আমিষ খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন আমিষ বিশ্লেষী (proteolytic) এনজাইম দ্বারা জটিল আমিষ আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড অণু গঠন করে। ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণীজ চর্বি প্রভৃতি স্নেহজ খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন স্নেহজ বিশ্লেষী (lypolitic) এনজাইম দ্বারা জটিল স্নেহজ খাদ্য আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সরল ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল অণু গঠন করে।

মানব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

খাদ্য পরিপাক উপযোগী কতগুলো অঙ্গ ও গ্রন্থির সমন্বয়ে মানুষের পরিপাকতন্ত্র গঠিত। বেঁচে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য গ্রহণ করি। আমাদের দেহ সে খাদ্যকে ভেঙ্গে ছোট ছোট অণুতে পরিণত করে এবং অপরিপাকৃত অংশ নিষ্কাশন করে। খাদ্য পরিপাককারী অঙ্গের অধিকাংশই নলাকার এবং এর দৈর্ঘ্য বরাবর বিভিন্ন অবস্থার খাদ্য ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিপাকতন্ত্র একটি লম্বা, প্যাঁচানো নল যা মুখছিদ্র হতে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সংশ্লিষ্ট কতগুলো গ্রন্থি নিয়ে গঠিত যেগুলো পরিপাক রস বা রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। মুখ থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত মানব পরিপাকনালির দৈর্ঘ্য প্রায় 29 ফুট যার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন প্রায় 11.5 লিটার পরিপাককৃত খাদ্য, তরল ও পরিপাক রস প্রবাহিত হয়। মানব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিম্নের ছক ও চিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:

মানব পরিপাকতন্ত্র

ক. পরিপাক নালি (গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক)

১। মুখছিদ্র
২। মুখবিবর
৩। গলবিল (দৈর্ঘ্য-12.5 সেমি)
৪। অন্ননালি (দৈর্ঘ্য-25 সেমি)
৫। পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য-30.5 সেমি, প্রস্থ 15.2 সেমি)
  (ক) কার্ডিয়াক অঞ্চল
  (খ) ফান্ডাস অঞ্চল
  (গ) দেহ অঞ্চল
  (ঘ) পাইলোরিক অঞ্চল
৬। ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য-6 মিটার)
  (ক) ডিউডেনাম
  (খ) জেজুনাম
  (গ) ইলিয়াম
৭। বৃহদান্ত্র (দৈর্ঘ্য-1.5 মিটার)
  (ক) সিকাম ও এপেনডিক্স
  (খ) কোলন
    (i) উর্ধ্বমুখী কোলন
    (ii) তির্যক কোলন
    (iii) নিম্নমুখী কোলন
    (iv) সিগময়েড কোলন
  (গ) রেকটাম
৮। পায়ুছিদ্র

খ. পরিপাক গ্রন্থি

১। লালাগ্রন্থি
২। যকৃত
৩। অগ্ন্যাশয়
৪। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
৫। আন্ত্রিক গ্রন্থি

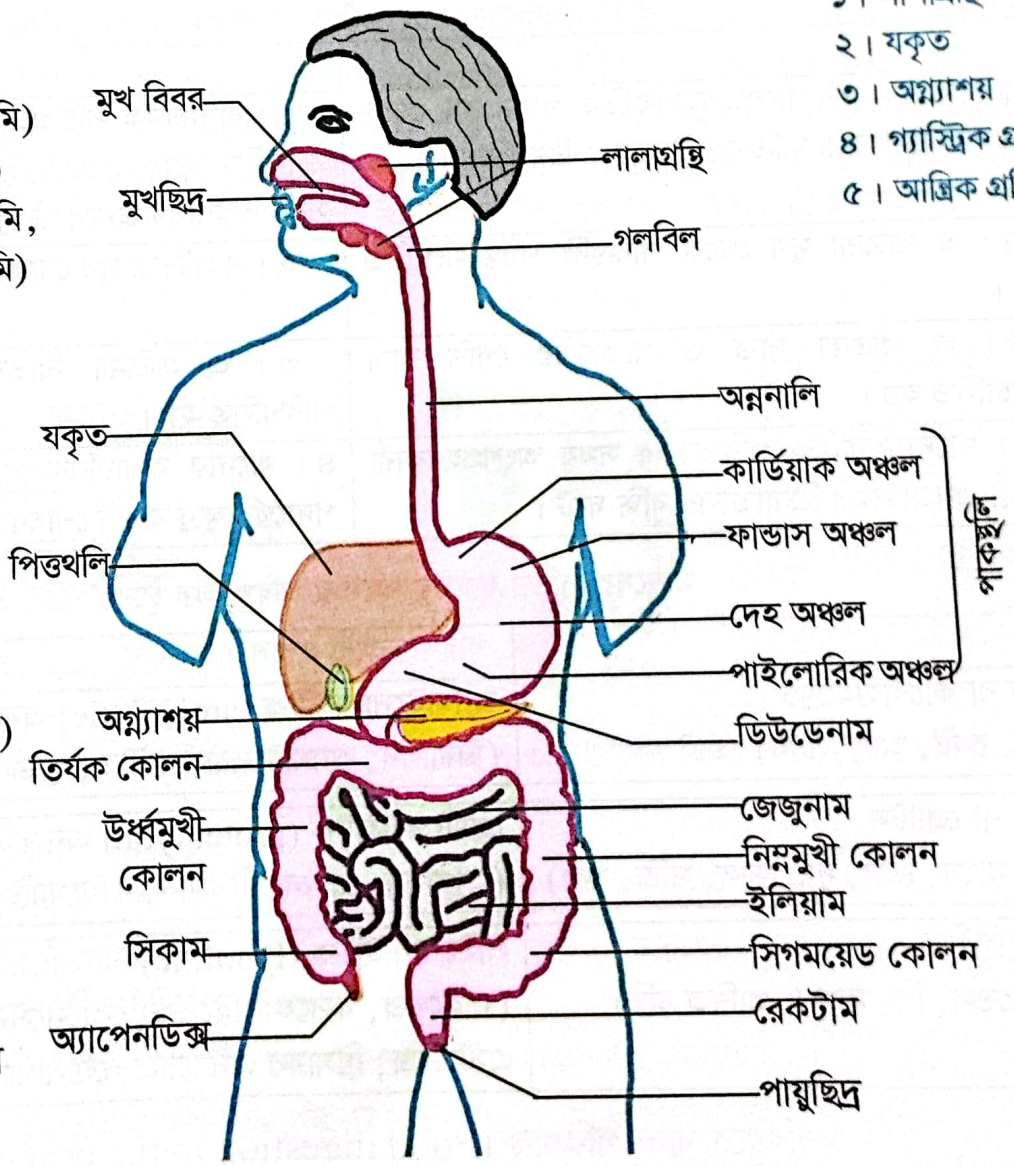

চিত্র ৩.১ মানব পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

মানুষের পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক

মানুষের পরিপাকতন্ত্র প্রতিদিন ভক্ষণকৃত জটিল খাদ্য দেহের গ্রহণযোগ্য সরল খাদ্যে রূপান্তর করার উপযোগী। এতে কতগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। খাদ্য পরিপাকের সাথে শতাধিক এনজাইম জড়িত। দেহে সঠিকভাবে পরিপাক এনজাইম উৎপাদিত না হলেই বদহজম দেখা দেয়। পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক দুটি প্রধান প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়, যথা-

❑ যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion): কতগুলো সঞ্চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যের পরিপাক নালির ভেতরে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে। এসময় খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশের চর্বণ, গলাধঃকরণ ও পরিবহন সম্পন্ন হয় এবং গাঠনিক ভাঙ্গণের মাধ্যমে উহা অতিক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়। খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাকের সময় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটে।

❑ রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion): কতগুলো ধারবাহিক বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে পানি, অম্ল, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সরল ও শোষণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

যান্ত্রিক পরিপাক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে পার্থক্য

যান্ত্রিক পরিপাক	রাসায়নিক পরিপাক
১। যান্ত্রিক পরিপাকে বৃহদাকৃতির খাদ্য বস্তু ভেঙ্গে পরিপাক উপযোগী অতিক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়।	১। রাসায়নিক পরিপাকে বৃহদাকৃতির শর্করা, আমিষ ও লিপিড অণু কতগুলো উপচিতিমূলক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সরল ও শোষণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়।
২। এ প্রক্রিয়া মুখ থেকে পাকস্থলি পর্যন্ত সংঘটিত হয়।	২। এ প্রক্রিয়া মুখ থেকে অন্ত্র পর্যন্ত সংঘটিত হয়।
৩। এ প্রক্রিয়া দাঁত ও পাকস্থলির পেশি দ্বারা পরিচালিত হয়।	৩। এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের এনজাইম দ্বারা পরিচালিত হয়।
৪। খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাকের সময় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটে।	৪। খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাকের সময় বিভিন্ন পুষ্টি পদার্থের ক্ষুদ্র কণার শোষণ ঘটে।

মানুষের বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পরিপাকীয় চূড়ান্ত পরিণতি

খাদ্যের ধরন	পরিপাককারী প্রধান এনজাইম	চূড়ান্ত পরিণতি
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (ভাত, রুটি, আলু, চিনি)	অ্যামাইলোলাইটিক (amylolytic) এনজাইম (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ বা প্রোটিন (মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, সব্জি, ফল)	প্রোটিওলাইটিক (proteolytic) এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন)	অ্যামিনো অ্যাসিড
স্নেহ বা লিপিড (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক (lypolitic) এনজাইম (লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, গ্লিসারল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ)	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

মুখবিবরে খাদ্য পরিপাক (Food digestion in the oral cavity)

মানুষের নাসিকার নিচে অবস্থিত আড়াআড়ি অবস্থিত **মুখছিদ্র** (mouth) পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। দুটি মাংসল *ঠোঁট* দ্বারা মুখছিদ্র খোলা ও বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মুখছিদ্রের পেছনে অবস্থিত প্রকোষ্ঠকে **মুখবিবর** (buccal cavity)

বলে। মুখবিবর ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। মুখবিবরে দাঁত ও জিহ্বা থাকে। মিউকাস আবরণী ওরাল মিউকোসা (oral mucosa) দ্বারা আবৃত থাকে বলে মুখবিবর সর্বদা ভেজা থাকে। মুখবিবর দুটি অংশে বিভক্ত যথা- ভেস্টিবিউল (vestibule) এবং প্রকৃত মুখবিবর (oral cavity proper)। দাঁত, গাল ও ঠোঁটের মধ্যবর্তী অংশকে ভেস্টিবিউল বলে। প্রকৃত মুখবিবর ঊর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালের অ্যালভিওলার প্রসেস দ্বারা আবদ্ধ থাকে। প্রকৃত মুখবিবরের ছাদের পশ্চাৎ অংশ কোমল তালু (soft palate) এবং সম্মুখ অংশ শক্ত তালু (hard palate) দিয়ে গঠিত। কোমল তালুর পেছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশিময় আলজিভ (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

প্রকৃত মুখবিবরের মেঝে মাইলোহাইয়েড পেশি (mylohyoid muscles) দ্বারা গঠিত এবং এর অধিকাংশই একটি বৃহৎ, নরম ও মাংসল জিহ্বা দ্বারা অধিকৃত থাকে। জিহ্বার পৃষ্ঠতলে অসংখ্য স্বাদকুঁড়ি (taste buds) বিদ্যমান যাদের প্রতিটিতে 50 থেকে 100টি স্বাদ গ্রাহক কোষ বা গাস্টাটরি কোষ (gustatory cells) থাকে। জিহ্বা ছাড়াও উপজিহ্বার আবরণ, গালের অন্তঃপ্রাচীর, অন্ননালির সম্মুখ অংশের প্রাচীরে স্বাদ গ্রাহক কোষগুলো প্যাপিলি (papillae) আকারে অবস্থান করে।

পরিণত মানুষের জিহ্বায় 2000 থেকে 8000 স্বাদকুঁড়ি থাকে। জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের স্বাদকুঁড়ি থাকে যেগুলো খাদ্যের পাঁচ ধরনের স্বাদ গ্রহণ করে। যেমন- জিহ্বার অগ্র-প্রান্তে মিষ্টতা (sweetness), অগ্র-পার্শ্বে লবণাক্ততা (saltiness), মধ্য-পার্শ্বে টক বা অম্লতা (sourness), কেন্দ্রীয় অংশ সুস্বাদুতা বা উমামি (umami/savoriness) এবং পেছনের অংশে তিক্ততা (bitterness) অনুভূতি গ্রহণের স্বাদকুঁড়ি বিদ্যমান থাকে। স্বাদকুঁড়িগুলো কোনো স্থায়ী গঠন নয় বরং প্রতি 5-10 দিনের মধ্যে এগুলো নতুন গঠন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। মুখবিবরে প্যারোটিড গ্রন্থি, সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি ও সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি নামক 3 জোড়া লালাগ্রন্থি উন্মুক্ত হয়। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয়। মুখবিবরে খাদ্যের স্বাদ অনুভূত হয় এবং খাদ্যবস্তু চর্বিত, পেষিত ও লালামিশ্রিত হয়ে গলাধঃকরণ উপযোগী হয়।

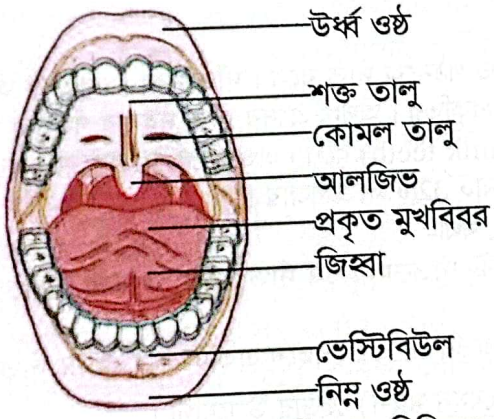

চিত্র ৩.২ মানুষের মুখবিবরের বিভিন্ন অংশ

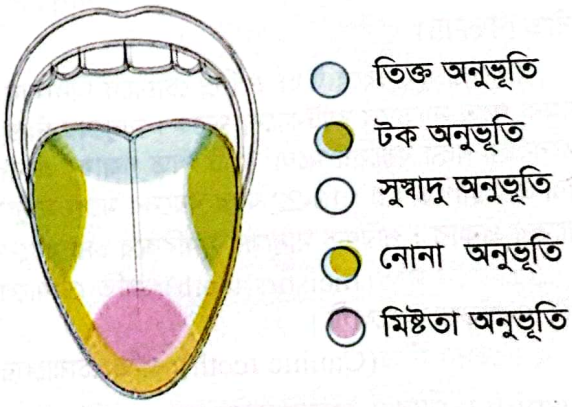

চিত্র ৩.৩ মানুষের জিহ্বায় স্বাদকুঁড়ির অবস্থান

❑ মুখবিবরে খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক

- খাদ্যবস্তু মুখবিবরে প্রবেশ করলে দাঁতের সাহায্যে চর্বিত হয়ে ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়ে খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক ঘটে। এ প্রক্রিয়াকে চর্বণ বা ম্যাস্টিকেশন (mastication) বলে। মানুষের চার ধরনের দাঁত (কর্তন, ছেদন, অগ্রপেষণ ও পেষণ) খাদ্য চর্বণে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে।
- মুখবিবরে খাদ্যবস্তু দাঁত, জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে নিষ্পেষিত হয় এবং লালা মিশ্রিত হয়।
- জিহ্বা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে; এটি মুখবিবরে খাদ্যের নড়া-চড়া ও গলাধঃকরণে সহায়তা করে।
- লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রাখে। এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বণের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে। লালা উত্তপ্ত ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে। এছাড়া এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে।

• লালামিশ্রিত পিণ্ডাকৃতির খাদ্যদ্রব্যকে খাদ্যমণ্ড বা বোলাস (bolus) বলে যা জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে গলবিলের মাধ্যমে পেছনের অন্ননালিতে প্রেরিত হয়।

• কোমল তালু খাদ্যমণ্ডকে নাসছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা দেয়।

• শ্বাসনালির ঢাকনা উপজিহ্বা বা এপিগ্লসিস (epiglottis) খাদ্যমণ্ডকে শ্বাসনালিতে প্রবেশে বাধা দেয়।

❑ মুখবিবরে খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক

(ক) শর্করা পরিপাক: লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে বিদ্যমান শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম *টায়ালিন* ও *ম্যাল্টেজ* দ্বারা জটিল কিছু শর্করা ম্যাল্টোজে এবং সামান্য ম্যাল্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়।

জটিল শর্করা —*টায়ালিন*→ ম্যাল্টোজ

ম্যাল্টোজ —*ম্যাল্টেজ*→ গ্লুকোজ

(খ) আমিষ পরিপাক: আমিষ খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল ও নরম হয়। কিন্তু এখানে কোনো প্রোটিওলাইটিক বা আমিষ বিশ্লেষী এনজাইম না থাকায় মুখবিবরে আমিষ খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

(গ) স্নেহ পরিপাক: মুখবিবরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোনো লাইপোলাইটিক এনজাইম থাকে না। এখানে খাদ্য চর্বিত ও লালামিশ্রিত হয়ে নরম হয়।

মুখবিবরে খাদ্যবস্তু মাত্র 5-30 সেকেন্ড অবস্থান করে। এখান থেকে লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালন (peristaltic movements) প্রক্রিয়ায় পাকস্থলিতে পৌছায়।

মানুষের দাঁত ও দন্ত সংকেত

দাঁত (Teeth)

মানুষের মুখবিবরে উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়ালে বিদ্যমান শক্ত, শৃঙ্গায়িত গঠনকে দাঁত বলে। দাঁতগুলো চোয়ালের অ্যালভিওলাই নামক গর্তে দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। মানুষের দাঁত ডিফায়োডন্ট প্রকৃতির। অর্থাৎ এদের দাঁত দুইবার গজায়। মানুষের দুই থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে 20টি দাঁত গজায়, এদের দুধ দাঁত (milk teeth) বলে। এগুলো 8-10 বছরের মধ্যে স্থায়ী দাঁত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। 18-22 বছর বয়সের মধ্যে মানুষের মুখে সর্বমোট 32টি দাঁত গজায়।

দাঁতের প্রকার : পরিণত মানুষের মুখবিবরে চার ধরনের দাঁত থাকে, যথা-

১। কর্তন দাঁত (Incisors teeth): প্রতি চোয়ালের সম্মুখের 4টি দাঁতকে কর্তন দাঁত বলে। এগুলো ধারালো এবং খাদ্য কাটা ও ছেঁড়ার উপযোগী।

২। ছেদন দাঁত (Canine teeth): প্রতি চোয়ালের প্রতি পার্শ্বে কর্তন দাঁতের পেছনে একটি করে ছেদন দাঁত বা কাসপিড (cuspids) থাকে। এগুলো কনিক্যাল আকৃতির এবং শক্ত খাদ্য (যেমন মাংস) ছেঁড়ার উপযোগী।

৩। অগ্রপেষণ দাঁত (Premolar teeth): প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে ছেদন দাঁতের পেছনে দুটি করে অগ্রপেষণ দাঁত বা বাইকাসপিড (bicuspids) থাকে। এগুলোর উর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাম্পযুক্ত। এরা খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করে।

৪। পেষণ দাঁত (Molar teeth): প্রতি চোয়ালের প্রতি পাশে অগ্রপেষণ দাঁতের পেছনে তিনটি করে পেষণ দাঁত থাকে। সর্বশেষ পেষণ দাঁতটি অনেক পড়ে উঠে। একে **আক্কেল দাঁত** (wisdom teeth) বলে। সকল পেষণ দাঁতের উর্ধ্বপ্রান্ত চওড়া ও খাঁজকাটা কাম্পযুক্ত। এরা খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করে।

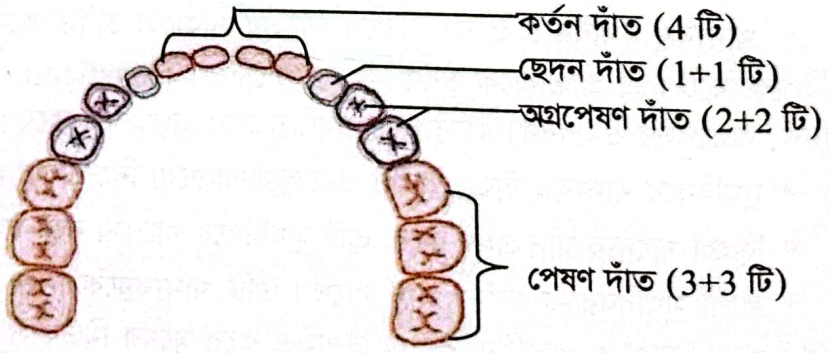

চিত্র ৩.৪ মানুষের চোয়ালে দাঁতের অবস্থান (উপরের অর্ধাংশ)

দন্ত সংকেত (Dental formula)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মুখবিবরে দাঁতের সংখ্যা, ধরণ ও অবস্থান যে সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাকে দন্ত সংকেত বলা হয়। বিভিন্ন দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা দাঁতের ধরন বুঝানো হয়। যেহেতু প্রতিটি চোয়ালের দুটি অর্ধাংশই হুবহু একরকম সেহেতু দন্ত সংকেত দ্বারা প্রাণীর মোট অর্ধেক দাঁত দেখানো হয়। দন্ত সংকেতে একটি আড়াআড়ি রেখার ওপরে ও নিচে বিভিন্ন দাঁতের নামের প্রথম অক্ষর ও সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। প্রতি চোয়ালের দাঁতের সংখ্যাকে 2 দ্বারা গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে প্রাণীর মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দন্ত সংকেত হলো:

$$\frac{I_2\ C_1\ PM_2\ M_3}{I_2\ C_1\ PM_2\ M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Food digestion in the stomach)

অন্ননালির পেছনে অবস্থিত থলিকাকার, পুরু প্রাচীরযুক্ত, J আকৃতির ও পেশিবহুল গঠনকে পাকস্থলি বলে। এটি উদরের উর্ধ্ব বাম অংশে অবস্থিত এবং পেছন দিকে অন্ত্রের ডিওডেনামের সাথে যুক্ত থাকে। পাকস্থলির অন্ননালি সংলগ্ন অংশকে **কার্ডিয়াক পাকস্থলি** এবং ক্ষুদ্রান্ত্র সংলগ্ন অংশকে **পাইলোরিক পাকস্থলি** বলে। মানুষের পাকস্থলি নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত:

১। **কার্ডিয়া** (Cardia): অন্ননালি সংলগ্ন পাকস্থলির অংশকে কার্ডিয়া বলে। এতে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় এবং এটি **কার্ডিয়াক স্ফিংটার** (cardiac sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।

২। **ফান্ডাস** (Fundus): পাকস্থলির কার্ডিয়ার নিচের ও বাম পাশের গম্বুজাকৃতির উঁচু অংশকে ফান্ডাস বলে। পরিপাকের সময় সৃষ্ট গ্যাস ফান্ডাসে জমা থাকে।

৩। **দেহ বা কর্পাস** (Body or corpus): পাকস্থলির প্রধান অংশকে দেহ বা কর্পাস বলে। এটি পাকস্থলির সর্ববৃহৎ অংশ এবং এখানে অধিকাংশ খাদ্যের পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৪। **অ্যান্ট্রাম** (Antrum): পাকস্থলির ফান্ডাসের নিচের বাঁকা অংশকে অ্যান্ট্রাম বলে। অন্ত্রে প্রবেশের পূর্বে এখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

৫। **পাইলোরাস** (Pylorus): অন্ত্রের ডিওডেনাম সংলগ্ন পাকস্থলির অংশকে পাইলোরাস বলে। এটি **পাইলোরিক স্ফিংটার** (pyloric sphincter) নামক পেশিবলয় ধারণ করে।

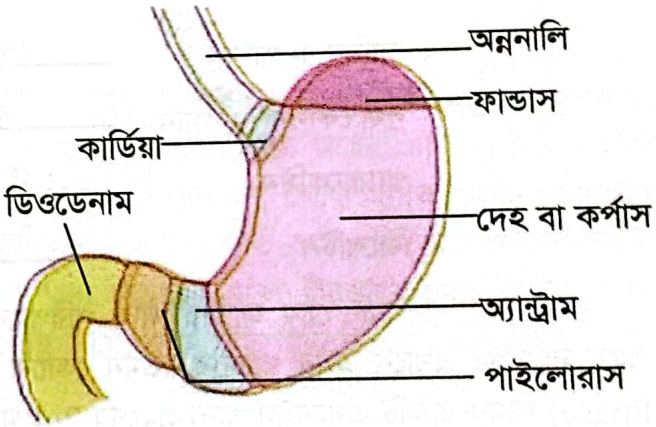

চিত্র ৩.৪ মানুষের পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাস আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে এবং প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে যেগুলো থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাক করে। পাকস্থলিতে অর্ধ-পরিপাককৃত খাদ্য অস্থায়ীভাবে জমা থাকে এবং এখানে খাদ্যবস্তু জীবাণুমুক্ত হয়। এছাড়া কিছু খাদ্য পাকস্থলিতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়ে যায়। মানুষের পাকস্থলি প্রতিদিন প্রায় 2.5 লিটার গ্যাস্ট্রিক রস উৎপাদন করে। প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর মানব পাকস্থলির প্রাচীরের মিউকাস আবরণ নতুন করে সৃষ্টি হয়, তা না হলে পাকস্থলি নিজেই পরিপাক হয়ে যেতো।

❑ পাকস্থলিতে খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখবিবরে লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু পাকস্থলিতে পৌঁছানোর পর খাদ্যবস্তু 2-24 ঘণ্টা অবস্থান করে। এখানে কার্ডিয়াক স্ফিংটার খাদ্যবস্তুর পশ্চাৎমুখী সঞ্চালন রোধ করে।
- প্রথমে পাকস্থলির প্রাচীরের প্যারাইটাল কোষ (parietal cell) থেকে নিঃসৃত পরিপাক রসে বিদ্যমান HCl দ্বারা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়, খণিজ লবণ দ্রবীভূত হয়, অন্থি ক্যালসিয়ামমুক্ত হয় এবং খাদ্য পরিপাকের জন্য অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টি হয়।

• খাদ্যবস্তু অন্ননালি হতে পাকস্থলিতে প্রবেশের পর প্রতি 15-20 সেকেন্ড পর পর পাকস্থলির প্রাচীরে একটি পেরিস্ট্যালটিক (peristaltic) সঞ্চালন প্রবাহিত হয়।

• পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু প্রথমে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নরম পেস্টে (paste) পরিণত হয়।

• পাকস্থলির গ্রন্থি নিঃসৃত পরিপাক রসের (gastric juice) সাথে পেস্ট খাদ্যবস্তু মিশ্রিত হয়ে অর্ধ তরল স্যুপের মতো পিচ্ছিল মিশ্রণে পরিণত হয় । খাদ্যের এ অবস্থাকে মণ্ড বা কাইম (chyme) বলে।

• এসময় পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালন মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে পাকস্থলির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কয়েকবার সামনে পেছনে সঞ্চালিত করে। এ সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু পরিপাক রসের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত হয়।

❑ পাকস্থলিতে খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক

(ক) শর্করা পরিপাক: পাকস্থলিতে শর্করা বিশ্লেষী কোনো এনজাইম থাকে না। এজন্য এখানে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোনো পরিপাক ঘটে না।

(খ) আমিষ পরিপাক: চিবানো ও লালা মিশ্রিত আমিষ খাদ্য পাকস্থলির গহ্বরে পৌঁছালে পাকস্থলির প্রাচীর হতে গ্যাস্ট্রিন (gastrin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে পরিপাক রস বা গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসৃত হয়। এ রসে পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম থাকে। এ দুটি নিষ্ক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে *পেপসিন* ও *রেনিন* নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। *পেপসিন* অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত করে। *রেনিন* দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে। এছাড়া গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান *জিলেটিনেজ* এনজাইম জিলেটিন আমিষকে আংশিকভাবে পরিপাক করে পেপটোন ও পলিপেটাইডে পরিণত করে।

আমিষ + পানি —*পেপসিন*→ প্রোটিওজ + পেপটোন

দুগ্ধ কেসিন + পানি —*রেনিন*→ প্যারাকেসিন

প্যারাকেসিন —*পেপসিন*→ পেপটোন

জিলেটিন —*জিলেটিনেজ*→ পেপটোন ও পলিপেটাইড

(গ) স্নেহ পরিপাক: স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের অধিকাংশ এনজাইম পাকস্থলির অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে পারে না বলে এখানে এসব খাদ্যের তেমন কোনো পরিপাক ঘটে না। তবে কেবল *গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ* (gastric lipase) নামক একটি এনজাইম খাদ্য গ্রহণের 2-4 ঘণ্টার মধ্যে ট্রাইগ্লিসারাইড নামক স্নেহ জাতীয় খাদ্যের প্রায় 30% ভেঙ্গে ডাইগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত করে।

পাকস্থলিতে অর্ধ-পরিপাককৃত অম্লীয় মণ্ড বা কাইম পাকস্থলির পাইলোরিক ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে প্রবেশ করে। এখানে পাইলোরিক স্ফিংটার পাকস্থলিতে খাদ্যবস্তুর পশ্চাৎমুখী সঞ্চালন রোধ করে।

পাকস্থলি নিজে কেন পরিপাক হয়ে যায় না?

(Why the stomach does not digest itself?)

পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান বিভিন্ন কোষ থেকে HCl ও বিভিন্ন পরিপাক এনজাইম নিঃসৃত হয়। এগুলো এতই শক্তিশালি যে এরা ধাতব পদার্থ ও জীবিত কোষকে বিগলিত করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পাকস্থলি নিজে কখনোই পরিপাক হয়ে যায় না। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে পাকস্থলি পরিপাক হয়ে যায় না:

১। মিউকাস আবরণ (Mucus coat): পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ থেকে নিঃসৃত মিউকাস আবরণ HCl ও বিভিন্ন পরিপাক এনজাইমের মাঝে ভৌত প্রতিবন্ধক তৈরি করে।

২। আঁটসাঁট সংযুক্তি (Tight Junction): পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান এপিথেলিয়াল কোষগুলোর আঁটসাঁট সংযুক্তি

HCl কিংবা পরিপাক এনজাইম পাকস্থলির কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৩। কোষের প্রতিস্থাপন (Replacement of cell): পাকস্থলির অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান এপিথেলিয়াল কোষগুলো 3-6 দিন বাঁচে। এগুলো সর্বদা নতুন কোষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে পাকস্থলির সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

৪। এনজাইম সক্রিয়করণ (Activation of enzyme): পরিপাক রসে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় প্রো-এনজাইম পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন পাকস্থলিতে HCl এর সংস্পর্শে সক্রিয় পেপসিন ও রেনিনে পরিণত হয়। এতে অনেক HCl প্রশমিত হয়।

৫। বাইকার্বনেট নিঃসরণ (Bicarbonate secretion): পাকস্থলির অন্তঃগাত্র হতে বাইকার্বনেট ক্ষারীয় দ্রবণ HCl কে প্রশমিত করে।

অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ পাকস্থলির প্রাচীরের এপিথেলিয়াম আবরণে ক্ষত সৃষ্টি করে ফলে প্রচণ্ড ব্যাথা বা রক্তক্ষরণ হতে পারে। পাকস্থলির এ অবস্থাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার বা পাকস্থলির ঘা (gastric ulcer) বলা হয়। তবে অতিরিক্ত ব্যাথানাশক ওষুধ (NSAID) সেবন এবং *Helicobacter pylori* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণেও গ্যাস্ট্রিক আলসার সৃষ্টি হয়। অতিমাত্রায় অ্যালকোহল পান, কিছু ওষুধ সেবন, *H. pylori* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কিংবা অন্যান্য কিছু কারণে অনেকসময় পাকস্থলিতে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাকে গ্যাস্ট্রাইটিস (gastritis) বলে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক (Food digestion in the intestine)

পাইলোরিক পাকস্থলির পশ্চাৎ অংশ থেকে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত সরু, প্যাঁচানো, 6-7 মিটার লম্বা নালিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। এর সম্মুখ অংশকে ডিওডেনাম (dudenum), মাঝের অংশকে জেজুনাম (jejunum) এবং পেছনের অংশকে ইলিয়াম (ileum) বলা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাই (villi) নামক আঙ্গুলসদৃশ্য অসংখ্য অভিক্ষেপ থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যবস্তু পরিপাক ও শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে।

❑ ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের দুধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। প্রথমত এখানে খাদ্যের সেগমেনটেশন (segmentation) ঘটে অর্থাৎ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সামনে-পেছনে সঞ্চালিত হয়। এতে অন্ত্রের প্রাচীরের বিভিন্ন কোষ থেকে নিঃসৃত আন্ত্রিক রস ও মিউকাসের সাথে খাদ্য ভালোভাবে মিশ্রিত হয়। পিত্তথলি থেকে আগত পিত্তরসে বিদ্যমান পিত্তলবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। দ্বিতীয়ত পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালনের (peristaltic movement) মাধ্যমে কাইম জাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ধীরভাবে প্রবাহিত হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে, কারণ এর ভেতর দিয়ে কাইম প্রতি মিনিটে এক সেন্টিমিটার গতিতে সঞ্চারিত হয়।

❑ ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইমে থাকে অর্ধ পরিপাককৃত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাকৃত স্নেহ খাদ্য। অম্লীয় কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে আন্ত্রিক গ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় ও পিত্তথলি থেকে যথাক্রমে আন্ত্রিকরস, অগ্ন্যাশয়রস ও পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে অন্ত্রের গহ্বরের খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়। ফলে অন্ত্রের ডিউডেনামে খাদ্যবস্তু আন্ত্রিকরস, অগ্ন্যাশয়রস ও পিত্তরস দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রক্রিয়াজাত হয়। এ নিঃসরণগুলোর সকলেই ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় খুব শীঘ্রই খাদ্য অম্লীয় অবস্থা থেকে নিরপেক্ষ অবস্থায় পরিণত হয় এবং অন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি হয়।

(ক) শর্করা পরিপাক

অন্ত্রের ডিওডেনামে বিদ্যমান অগ্ন্যাশয় রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় পলিস্যাকারাইডকে (জটিল শর্করা) ডাইস্যাকারাইড ও কিছু ডাইস্যাকারাইডকে মনোস্যাকারাইডে বা গ্লুকোজে পরিণত করে। যেমন-

স্টার্চ —(অ্যামাইলেজ)→ ম্যাল্টোজ (ডাইস্যাকারাইড)

গ্লাইকোজেন —(অ্যামাইলেজ)→ ম্যাল্টোজ (ডাইস্যাকারাইড)

ম্যাল্টোজ —(ম্যাল্টেজ)→ গ্লুকোজ (মনোস্যাকারাইড)

অন্ত্রের ইলিয়ামের বিদ্যমান আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইমসমূহ সকল ডাইস্যাকারাইডকে নিম্নরূপে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে গ্লুকোজে পরিণত করে।

ম্যাল্টোজ + H_2O —(ম্যাল্টেজ)→ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

আইসোম্যাল্টোজ + H_2O —(আইসোম্যাল্টেজ)→ ম্যাল্টোজ + গ্লুকোজ

সুক্রোজ + H_2O —(সুক্রেজ)→ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

ইনভারটোজ + H_2O —(ইনভারটেজ)→ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

ল্যাকটোজ + H_2O —(ল্যাক্টেজ)→ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

(খ) আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম *ট্রিপসিন*, *কাইমোট্রিপসিন*, *কার্বোক্সিপেপটাইডেজ*, *ট্রাইপেপটাইডেজ*, *ডাইপেপটাইডেজ*, *কোলাজিনেজ* , *ইলাস্টেজ* ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এরা আমিষ খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে-

প্রোটিওজ ও পেপটোন —(ট্রিপসিন)→ পলিপেপটাইড

প্রোটিওজ ও পেপটোন —(কাইমোট্রিপসিন)→ পলিপেপটাইড

পলিপেপটাইড —(কার্বোক্সিপেপটাইডেজ)→ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো অ্যাসিড

পলিপেপটাইড —(অ্যামিনোপেপটাইডেজ)→ অ্যামিনো অ্যাসিড

ট্রাইপেপটাইড —(ট্রাইপেপটাইডেজ)→ অ্যামিনো অ্যাসিড

ডাইপেপটাইড —(ডাইপেপটাইডেজ)→ অ্যামিনো অ্যাসিড

কোলাজেন (মাছ ও মাংসের প্রোটিন) —(কোলাজিনেজ)→ অ্যামিনো অ্যাসিড

ইলাস্টিন (যোজক কলার প্রোটিন) —(ইলাস্টেজ)→ পেপটাইড

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম *ইরেপসিন* ডাইপেপটাইডকে এবং *অ্যামিনোপেপটাইডেজ* পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\textit{ইরেপসিন}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\textit{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

আন্ত্রিক রসের *ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ* (DNAase) এবং *রাইবোনিউক্লিয়েজ* (RNAase) এনজাইমের ক্রিয়ায় যথাক্রমে DNA ও RNA পরিপাক হয়ে এদের মনোনিউক্লিওটাইড অণু সৃষ্টি করে।

DNA/ RNA $\xrightarrow{\textit{DNA এজ / RNA এজ}}$ DNA/ RNA মনোনিউক্লিওটাইড

(গ) স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে যকৃত নিঃসৃত পিত্তরস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোনো এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে বিদ্যমান পিত্তলবণ **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate) ও **সোডিয়াম টাউরোকোলেট** (sodium taurocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **ইমালসিফিকেশন** (imulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম *লাইপেজ*, *ফসফোলাইপেজ* ও *কোলেস্টেরল এস্টারেজ* থাকে। এরা স্নেহদানাকে নিম্নরূপে পরিপাক করে-

চর্বি $\xrightarrow{\textit{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\textit{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\textit{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল

আন্ত্রিক রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম *লাইপেজ*, *লেসিথিনেজ* ও *মনোগ্লিসারাইডেজ* থাকে। এরা স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে-

ট্রাইগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\textit{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও মনোগ্লিসারাইড

লেসিথিন $\xrightarrow{\textit{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড+ গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড + কোলিন

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\textit{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

পরিপাকীয় রোগ/পরিপাকঅন্ত্রীয় রোগ

(Digestive disorders/ Gastrointestinal (GI) disorder)

পরিপাকতন্ত্র ঠিকমত কাজ না করার কারণে সেব রোগ বা ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় তাদের পরিপাকঅন্ত্রীয় রোগ বলা হয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ পরিপাকঅন্ত্রীয় রোগকে প্রধানত জৈব এবং কার্যকরি এ দুভাগে ভাগ করেছেন। পরিপাকতন্ত্রের গাঠনিক অস্বাভাবিকতার কারণে জৈব পরিপাকান্ত্রিয় রোগ (Organic GI disorders) এবং পরিপাক ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতার কারণে কার্যকরি পরিপাকান্ত্রিয় রোগ (Functional GI disorders) সৃষ্টি হয়। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ পরিপাকঅন্ত্রীয় রোগ হলো:

পরিপাকঅঙ্গীয় রোগ	প্রধান উপসর্গ
ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রম (IBS)	পেটে ব্যাথা, ডায়োরিয়া, কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য
অন্ত্রে ব্যাক্টেরিয়ার অতিবৃদ্ধি (SIBO)	পেট ফোলা, ডায়োরিয়া, কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য
গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিস (GERD)	অন্ননালির প্রদাহ
পিত্তপাথর (Gallstones)	পাঁজরের নিচে স্থায়ী ব্যাথা, বমি
সিলিয়াক ডিজিস (Celiac disease)	দীর্ঘস্থায়ী ডায়োরিয়া, কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য
ক্রোন ডিজিস (Crohn's disease)	ক্রনিক ডায়োরিয়া, রক্তযুক্ত পায়খানা
আলসারেটিভ কোলিটিস (UC)	দীর্ঘস্থায়ী ডায়োরিয়া, পেটে ব্যাথা

একনজরে খাদ্য পরিপাককারী গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমসমূহ

শর্করা পরিপাককারী এনজাইমসমূহ

এনজাইম	উৎস	কার্যপদ্ধতি
টায়ালিন	লালাগ্রন্থি	জটিল শর্করাকে ম্যাল্টোজে পরিণত করে।
অ্যামাইলেজ	অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেনকে ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।
আইসোম্যাল্টেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	আইসোম্যাল্টোজকে ম্যাল্টোজ ও গ্লুকোজে
ম্যাল্টেজ	লালাগ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি	ম্যাল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
সুক্রেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	সুক্রোজকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিণত করে।
ল্যাকটেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।
ইনভারটেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ইনভারটোজকে ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

আমিষ পরিপাককারী এনজাইমসমূহ

এনজাইম	উৎস	কার্যপদ্ধতি
পেপসিন	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি	আমিষকে পেপটোন ও প্রোটিওজে পরিণত করে।
রেনিন	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি	দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।
জিলেটিনেজ	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি	জিলেটিনকে পেপটোন ও পলিপেটাইডে পরিণত করে।
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	পেপটোন ও প্রোটিওজকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
কাইমোট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	পেপটোন ও প্রোটিওজকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
কার্বক্সিপেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
অ্যামিনোপেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	পলিপেপটাইডকে ডাইপেপটাইড ও অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
ট্রাইপেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
ডাইপেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
কোলাজিনেজ	অগ্ন্যাশয়	কোলাজেনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।
ইলাস্টেজ	অগ্ন্যাশয়	ইলাস্টিনকে পেপটাইডে পরিণত করে।
ইরেপসিন	আন্ত্রিক গ্রন্থি	ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

স্নেহ বা লিপিড পরিপাককারী এনজাইমসমূহ

এনজাইম	উৎস	কার্যপদ্ধতি
লাইপেজ	অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি	চর্বি ও ট্রাইগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।
ফসফোলাইপেজ	অগ্ন্যাশয়	লেসিথিন ও সেফালিনকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।
কোলেস্টেরল এস্টারেজ	অগ্ন্যাশয়	কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরলে পরিণত করে।
লেসিথিনেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	লেসিথিনকে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, ফসফোরিক অ্যাসিড ও কোলিনে পরিণত করে।
মনোগ্লিসারাইডেজ	আন্ত্রিক গ্রন্থি	মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

মানব পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাকের সারসংক্ষেপ

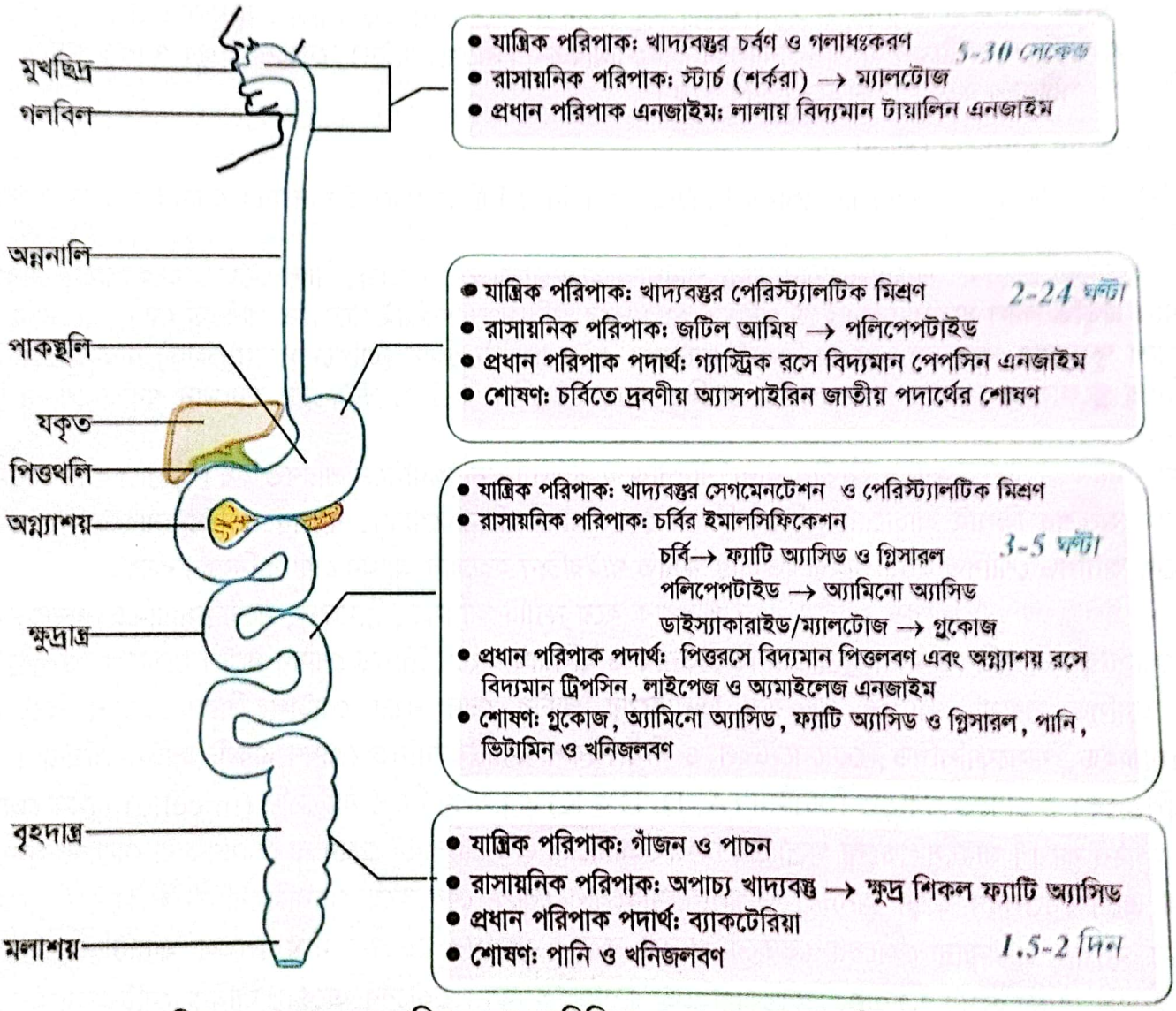

চিত্র ৩. ৭ মানুষের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে খাদ্যবস্তুর পরিপাক

খাদ্যসার শোষণ (Absorption of food)

যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল) পরিপাকনালির অন্ত্র হতে এপিথেলিয়ামের মাধ্যমে রক্ত ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে খাদ্যসার শোষণ বলে। খাদ্যসার শোষণ একটি

জটিল প্রক্রিয়া। পরিপাককৃত অধিকাংশ খাদ্যসার, ভিটামিন, খনিজলবণ ও পানির সাথে ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেনে বিদ্যমান ভিলাই দ্বারা সক্রিয় পরিবহন বা ব্যাপন কিংবা এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে শোষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের 90% শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে, বাকী 10% সংঘটিত হয় বৃহদান্ত্র ও পাকস্থলিতে।

অন্ত্রীয় ভিলাই (villi; একবচনে- villus) ক্ষুদ্র, নলাকার, আঙ্গুলের ন্যায় গঠন বিশেষ যেগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেনে প্রক্ষেপিত থাকে। মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রায় 5 মিলিয়ন ভিলাই 10-40/বর্গমিলিমিটার ঘনত্বে বিস্তৃত থেকে প্রায় 10 বর্গমিটার শোষণতল সৃষ্টি করে। প্রতিটি ভিলাস 0.5-1.6 মিলিমিটার লম্বা, অন্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীরের এন্টারোসাইট কোষ [*অন্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীরের খাদ্য শোষণকারী কোষগুলোকে এন্টারোসাইট কোষ বলে*] থেকে সৃষ্টি হয় এবং প্রান্তে অসংখ্য সূক্ষ্ম অভিক্ষেপ বা মাইক্রোভিলাই সৃষ্টির মাধ্যমে ব্রাশ বর্ডার (brush border) গঠন করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনামের ভিলাইগুলো আকারে বড় এবং সংখ্যায় অধিক কিন্তু ইলিয়ামের ভিলাইগুলো আকারে ছোট এবং সংখ্যায় কম।

ভিলাই ও মাইক্রোভিলাই অন্ত্রীয় শোষণ তলের আয়তন যথাক্রমে 40গুণ ও 600গুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্ত্রের পুষ্টি শোষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং পাশাপাশি এরা কিছু পরিপাকীয় এনজাইম নিঃসরণ করে। ভিলাসে প্রসারিত কৈশিকনালিকা অ্যামিনো অ্যাসিড ও সরল শর্করা অণু পরিবহন করে হেপাটিক পোর্টাল সংবহনতন্ত্রে প্রেরণ করে এবং ভিলাসে প্রসারিত ল্যাকটিয়েল বা লসিকানালিকা কাইলোমাইক্রন (লিপোপ্রোটিন), কোলেস্টেরল ও কিছু অ্যাম্ফিপ্যাথিক প্রোটিন অণু পরিবহন করে লসিকাতন্ত্রে প্রেরণ করে।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ

বিভিন্ন হরমোন দ্বারা খাদ্যসার শোষণ নিয়ন্ত্রিত হয়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

(ক) **শর্করা শোষণ** : শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ, জাইলোজ, লেবুলোজ, ম্যানোজ প্রভৃতি সরল মনোস্যাকারাইডে পরিণত হয়। তবে অধিকাংশ শর্করাই গ্লুকোজে পরিণত হয়। Na^+ এবং ATP সহযোগে ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এন্টারোসাইট কোষ (এপিথেলিয়াম কোষ) দ্বারা সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে গ্লুকোজ ও অন্যান্য সরল শর্করা শোষিত হয়। *ইনসুলিন* ও *গ্লুকোকর্টিকয়েড* হরমোন শর্করা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) **আমিষ শোষণ:** আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ, ব্যাপন ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড শোষিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত *থাইরক্সিন* হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) **লিপিড শোষণ:** লিপিড জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, মনোগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেরল-এ পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও ইলিয়াম অংশে লিপিড শোষণ ঘটে। গ্লিসারল ও ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড সরাসরি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিলাইয়ের প্রাচীর ভেদ করে পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে। কিন্তু মনোগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল ও দীর্ঘ শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এগুলো প্রথমে পিত্তলবণ ও চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (A, D, E ও K) এর সাথে মিশে মাইসেলি (micelle) নামক ছোট ছোট চর্বি কণা গঠন করে। মাইসেলিগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই প্রাচীরের এন্টারোসাইট কোষ বা শোষণকারী কোষের মুক্ত প্রান্তের সংস্পর্শে এলে পিত্তলবণ ছাড়া অন্যান্য উপাদান মাইসেলি থেকে বের হয়ে প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। কোষের ভেতরে দীর্ঘ শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড প্রথমে *থায়োকাইনেজ* এনজাইমের ক্রিয়ায় ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয়। কোষের এন্ডোপ্লাজমিক রেটিক্যুলামের ভেতরে এসব ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল ও প্রোটিন একত্রে যুক্ত হয়ে কাইলোমাইক্রন (chylomicron) নামক বৃহৎদাকৃতির স্নেহকণার সৃষ্টি করে যেগুলো এক্সোসাইটোসিস (exocytosis) প্রক্রিয়ায় ভিলাইয়ের এন্টারোসাইট কোষ পর্দা অতিক্রম করে লসিকাবাহে প্রবেশ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত *থাইরক্সিন* হরমোন লিপিড শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

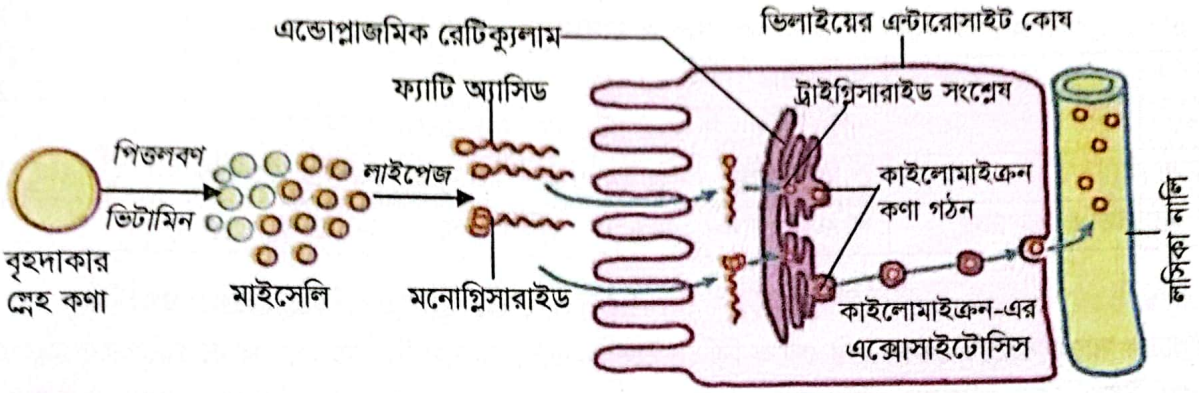

চিত্র: ৩.৬ অন্ত্রে খাদ্যসার (ফ্যাটি অ্যাসিড) শোষণ

(ঘ) পানি শোষণ: ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অভিস্রবন প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। সাধারণত প্রতি ঘণ্টায় 200-400 মিলিলিটার পানি শোষিত হয়।

(ঙ) খনিজলবণ শোষণ: বৃহদান্ত্রের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অধিকাংশ খনিজলবণ সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে শোষিত হয়।

(চ) ভিটামিন শোষণ: ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই কর্তৃক পানিতে দ্রবীভূত (C ও B) বা চর্বিতে দ্রবীভূত ভিটামিন (A, D, E ও K) ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

খাদ্যসার পরিবহন

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসার অন্ত্রের ভিলাইয়ের এপিথেলিয়াল কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ভিলাসের অভ্যন্তরে থাকে কৈশিক জালিকা (capillaries), লসিকাতন্ত্রের ল্যাকটিয়েল (lacteal)। গ্লুকোজ ও অ্যামিনো অ্যাসিড ভিলাসের কোষ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিকনালিতে আসে। অতঃপর এরা হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে আসে এবং যকৃত থেকে হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে। ল্যাকটিয়েল থেকে থোরাসিক লসিকা নালির (thoracic lymphatic canal) মাধ্যমে বাহিত হয়ে শিরাতন্ত্রের রক্ত প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডে আসে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

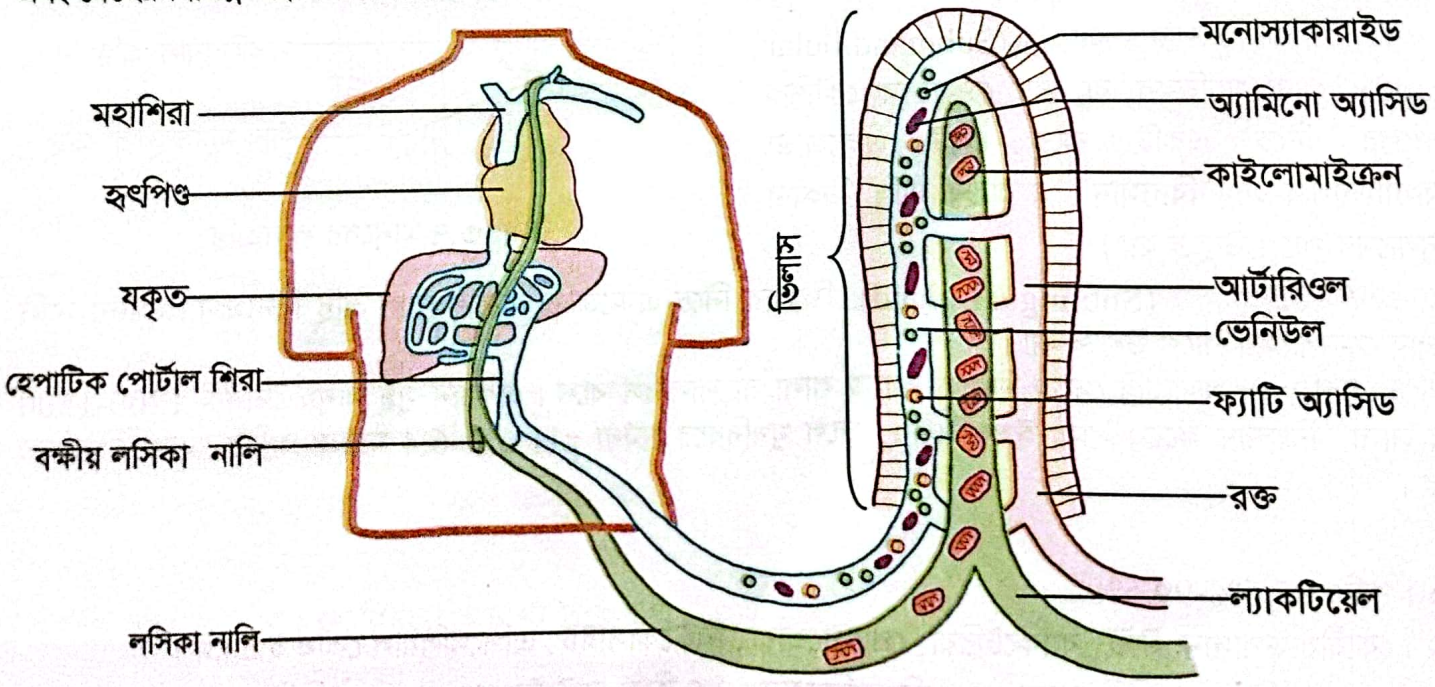

চিত্র: ৩.৫ অন্ত্রের প্রাচীর (ভিলাই) থেকে রক্তনালি ও কৈশিকনালির মাধ্যমে দেহে খাদ্যসার পরিবহন

মানবদেহে খাদ্যসারের ব্যবহার

খাদ্যসার	ব্যবহার
গ্লুকোজ	শক্তি উৎপাদন + গ্লাইকোজেন হিসেবে দেহে সঞ্চয়
অ্যামিনো অ্যাসিড	দৈহিক বৃদ্ধি, এনজাইম ও হরমোন সৃষ্টি + শক্তি উৎপাদন + ইউরিয়া সৃষ্টি
ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল	শক্তি উৎপাদন + চর্বি হিসেবে দেহে সঞ্চয়

৩.২ পরিপাক গ্রন্থির কাজ (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পৌষ্টিকগ্রন্থি বা পরিপাক গ্রন্থি বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি বিদ্যমান, যথা- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত ও স্বতন্ত্র গঠন বিশিষ্ট। নিচে মানুষের বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির বিবরণ দেয়া হলো:

লালাগ্রন্থি (Salivary glands)

মানুষের মুখবিবরের দুপাশে 3 জোড়া লালাগ্রন্থি বিদ্যমান। লালাগ্রন্থিগুলো এপিথেলিয়াম আবৃত গোলাকার বা ডিম্বাকার রসনিঃসারী অসংখ্য থলি নিয়ে গঠিত। থলির প্রাচীরে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ থাকে। প্রতিটি থলি হতে একটি নালি বের হয়ে লালাগ্রন্থির মূল নালিতে যুক্ত হয়। মানুষের তিন ধরনের লালাগ্রন্থি থাকে। এগুলো হলো-

১। প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland): এগুলো সবচেয়ে বড় লালাগ্রন্থি। প্রতি কানের নিচে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি বিদ্যমান। প্রতিটি গ্রন্থি থেকে একটি নালি বের হয়ে দ্বিতীয় ঊর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে ভেস্টিবিউলে (মুখবিবর) উন্মুক্ত হয়। প্যারোটিড গ্রন্থি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে ফুলে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে মাম্পস (mumps) বলে।

২। সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular gland): প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি বিদ্যমান। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার ফ্রেনুলামের পাশে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র: ৩.৭ মানুষের লালাগ্রন্থি

৩। সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland): জিহ্বার নিচে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি বিদ্যমান। এদের নালি জিহ্বার ফ্রেনুলামের পাশে উন্মুক্ত হয়।

লালা (Saliva): লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক 1200-1500 মিলি লালা নিঃসরণ করে। লালা ঈষৎ অম্লীয়, ফলে মুখবিবরে সর্বদা pH 6.2–6.4 মাত্রায় অম্লীয় অবস্থা বিরাজিত থাকে।

লালার উপাদান

১। পানি: 95.5%-99.5%.

২। কোষীয় উপাদান: ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।

৩। গ্যাস: প্রতি 100 মিলি লালায় 1 মিলি অক্সিজেন, 2.5 মিলি নাইট্রোজেন এবং 50 মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৪। অজৈব পদার্থ: প্রায় 0.2%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫। জৈব পদার্থ: প্রায় 0.3%; এনজাইম (টায়ালিন, ম্যাল্টেজ, লাইসোজাইম, লিঙ্গুয়াল লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিওলাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), অপিওরফিন, হ্যাপ্টোকোরিন, মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো অ্যাসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি (IgA) ইত্যাদি।

লালার কাজ

১। যান্ত্রিক কাজ: লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রেখে কথা বলতে সাহায্য করে। এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বনের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে। লালা উত্তপ্ত ও প্রদাহিক বস্তুকে প্রশমিত করে মুখের মিউকাস প্রাচীরকে রক্ষা করে। লালায় IgA এবং lysozyme থাকায় এটি খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুকে ধ্বংস করে।

২। খাদ্য পরিপাক: লালায় শর্করা পরিপাককারী *টায়ালিন* ও *ম্যাল্টেজ* এনজাইম থাকে। এরা জটিল শর্করাকে সরলে পরিণত করে।

৩। রেচন: কিছু ক্ষতিকর বর্জ্য যেমন- ইউরিয়া, ভারী ধাতু (Hg, Pb, As), থায়োসায়ানেট, মরফিন, অ্যান্টিবায়োটিক, ইথাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি লালার মাধ্যমে দেহ হতে রেচন বর্জ্য হিসেবে বহিষ্কৃত হয়।

৪। স্বাদ গ্রহণ: স্বাদ হলো এক ধরনের রাসায়নিক অনুভূতি। লালা খাদ্যের বিভিন্ন পদার্থকে দ্রবীভূত করে জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে। কম লালা নিঃসরী মানুষ ডিসজিউসিয়া (dysgeusia) রোগে ভোগে।

৫। দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা: দেহে পানিশূন্যতা দেখা দিলে লালা নিঃসরণ কমে যায় এবং এতে তৃষ্ণা বোধ হয়। তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি পান করলে দেহের পানিসাম্যতা রক্ষা হয়।

৬। বাফার: লালায় বিদ্যমান বাইকার্বনেট, ফসফেট ও মিউসিন বাফার হিসেবে কাজ করে। লালায় বিদ্যমান বাইকার্বনেট লালার অম্লতা pH 6.2–6.4 মাত্রায় বজায় রাখে। ফলে মুখে অ্যাসিডের মাত্রা কম থাকায় দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ সম্ভব হয়।

যকৃত (Liver)

যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের যকৃতের ওজন 1.44–1.66 কেজি (3.2–3.7 পাউন্ড)। এটি উদর গহ্বরের উপরের দিকে পাকস্থলির ডান পার্শ্বে ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে অবস্থিত। এর রঙ লালচে বাদামী এবং দেখতে কিছুটা ত্রিকোণাকার। যকৃত ডানখণ্ড (right lobes), বামখণ্ড (left lobes), ক্যড্যাট (caudate) ও কোয়াড্রেট (quadrate) নামের চারটি অসম্পূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ডানখণ্ডটি যকৃতের সবচেয়ে বড় অংশ গঠন করে। যকৃতের উপরের প্রান্তটি উত্তল এবং ডায়াফ্রামের সমান্তরালে অবস্থান করে, নিচের প্রান্তটি অবতল এবং পাকস্থলিকে আবৃত করে রাখে।

যকৃত বাইরের দিকে গ্লিসন ক্যাপস্যুল (Glisson's capsule) নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যকৃতকে হেপাটিক লোবিউল (hepatic lobules) নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। প্রতিটি হেপাটিক লোবিউলে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে যাকে পরিবেষ্টন করে ষড়ভূজাকৃতির বহুসংখ্যক যকৃতকোষ অবস্থান করে। লোবিউলে অসংখ্য পিত্তনালি ও রক্তনালি থাকে। পিত্তনালিগুলো মিলিত হয়ে সাধারণ হেপাটিক নালি গঠন করে।

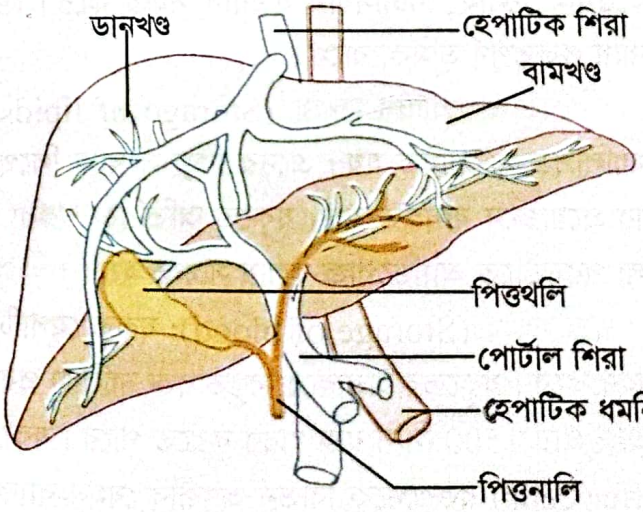

চিত্র: ৩.৮ মানুষের যকৃত

হেপাটিক নালি পিত্তথলির সিস্টিক নালির সাথে মিলিত হয়ে সাধারণ পিত্তনালি গঠন করে যা পুনরায় অগ্ন্যাশয় নালির সাথে অ্যাম্পুলা অব ভাটার (amphlla of vater) গঠন করে। হেপাটিক কর্ডের ফাঁকে ফাঁকে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামে ফাঁকা স্থান এবং রক্ত ক্যানালিক্যুলি বিদ্যমান থাকে। সাইনুসয়েডগুলো কাপফার কোষ (Kupffer's cells) নামক বিশেষ ধরনের শ্বেতরক্তকণিকা দ্বারা আবৃত থাকে। এসব কোষ অণুজীব, মৃত রক্তকণিকা ও বহিরাগত বস্তুকে গলাধঃকরণ করে।

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage and Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক গ্রন্থি যকৃত। যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয় যা লিপিড খাদ্য পরিপাকের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এছাড়া যকৃতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এজন্য যকৃতকে মানবদেহের জৈব রসায়নাগার (organic laboratory) বলা হয়। পাকস্থলি ও অন্ত্র হতে সকল রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃতে খাদ্যকণা ও ওষুধ ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় যা দেহ সহজেই গ্রহণ করতে পার। মানুষের যকৃতকে একটি দ্রুততম প্রসেসর সহ সুপার কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা যায়, কারণ এটি একাধারে 500 এর অধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে। একটি সুস্থ যকৃত প্রতিদিন প্রায় 720 লিটার রক্ত পরিশোধন করে।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage function of liver)

১। গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of glycogen): রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ যকৃতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয় তাকে গ্লাইকোজেনেসিস (glycogenesis) বলে। গ্লাইকোজেন হলো গ্লুকোজের পলিমার। কয়েক হাজার গ্লুকোজ অণু 1-4 ও 1-6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে গ্লাইকোজেন গঠন করে। অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন হরমোন দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে গ্লাইকোজেনেসিস সংঘটিত হয়। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

২। পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of bile): যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যকৃত দৈনিক প্রায় 400 থেকে 800 মিলিলিটার পিত্তরস তৈরি করে।

৩। ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of vitamins): যকৃতে ভিটামিন A, D, E, K, B_6 ও B_{12} সঞ্চিত হয়। ভিটামিন B_6 বা পাইরিডক্সিন দেহের স্নায়ুতন্ত্র ও অনাক্রম্যতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন B_{12} বা ফলিক অ্যাসিড ভ্রূণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু গঠনে এবং লোহিত রক্ত কণিকা উৎপাদনে প্রয়োজন হয়।

৪। খনিজদ্রব্য সঞ্চয় (Storage of minerals): যকৃত বিভিন্ন ধরনের খনিজদ্রব্য যেমন- কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট, মলিবডেনাম, লৌহ, পটাসিয়াম ইত্যাদি সঞ্চয় করে। ভিটামিনের সাথে এসব খনিজদ্রব্য নানারকম পুষ্টি পদার্থ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫। লিপিড ও প্রোটিন সঞ্চয় (Storage of lipids and Protein): যকৃতে বিপুল পরিমাণে কোলেস্টেরল ও ফসফোলিপিড সংশ্লেষিত হয়। এদের কিছু সংখ্যক লিপোপ্রোটিন হিসেবে যকৃতে সঞ্চিত থাকে এবং দেহের অন্যান্য অংশের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অতিরিক্ত শর্করা ও প্রোটিন থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয় যেগুলো পরবর্তীতে অ্যাডিপোজ কলায় সঞ্চিত হয়।

৬। রক্ত সঞ্চয় (Storage of blood): যকৃত হেপাটিক পোর্টাল শিরা ও হেপাটিক ধমনির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রক্ত গ্রহণ করে। যকৃতের অভ্যন্তরে বিস্তৃত রক্ত নালিকা প্রবাহিত থাকায় এটি বিপুল পরিমাণ রক্তের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে এবং প্রায় 1500 সিসি রক্ত ধারণ করতে পারে। যকৃতে বিদ্যমান ম্যাক্রোফেজ শ্বেত রক্তকণিকা বা কাপফার কোষ (kupffer cells) রক্ত থেকে বিভিন্ন অণুজীব যেমন-ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাক ইত্যাদি অপসারণ করে। এছাড়া যকৃতে রক্ত থেকে মৃতপ্রায় লোহিত রক্তকণিকা, মৃত কোষ, ক্যানসার কোষ ও কোষীয় বর্জ্য অপসারিত হয়।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা

১। শর্করা বিপাক (Carbohydrate metabolism): রক্তের স্বাভাবিক গ্লুকোজ মাত্রা বজায় রাখতে যকৃত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করে। যেমন-

(ক) গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis): রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ফসফোরাইলেজ এনজাইমের ক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ সৃষ্টি হয় তাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে। এ প্রক্রিয়াটি ইপিনেফ্রিন ও গ্লুকাগন হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{ফসফোরাইলেজ এনজাইম}}$ গ্লুকোজ

(খ) গ্লাইকোনিউজেনেসিস (Gluconeogenesis): রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত কমে গেলে (hypoglycemia) যকৃত কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড ও গ্লিসারল থেকে গ্লাইকোনিউজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ তৈরি করে রক্তে প্রেরণ করে। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়ায় অশর্করা জাতীয় জৈব অণু থেকে গ্লুকোজ সৃষ্টি হয় তাকে গ্লাইকোনিউজেনেসিস বলে।

অ্যামিনো অ্যাসিড/ল্যাকটিক অ্যাসিড/ পাইরুভিক অ্যাসিড/ গ্লিসারল $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ গ্লুকোজ

(গ) লাইপোজেনেসিস (Lipogenesis): যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে লিপিড সৃষ্টি হয় তাকে লাইপোজেনেসিস বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে উহা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইডে (triglyceride=TG) রূপান্তর করে। এ ট্রাইগ্লিসারাইড কোষে চর্বি হিসেবে সঞ্চিত হয়। এজন্য অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড (TG) মাত্রা বেড়ে যায় যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের প্রধান কারণ।

গ্লুকোজ $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ ট্রাইগ্লিসারাইড

২। লিপিড বিপাক (Lipid metabolism): যকৃতকোষ বা হেপাটোসাইটস লিপিড বিপাকীয় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে:

(ক) যকৃতে ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙ্গে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (ATP) তৈরি হয় যা পেশির প্রসারণ ও শিথিলে ব্যবহৃত হয়।

(খ) যকৃত লিপোপ্রোটিন সংশ্লেষ করে যা কোষের বাইরে ও ভেতরে ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) যকৃত কিছু পরিমাণ ট্রাইগ্লিসারাইড সঞ্চয় করে।

(ঘ) যকৃত কোলেস্টেরল সঞ্চয় করে এবং এর দ্বারা সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট ও সোডিয়াম টাউরোকোলেট নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ পিত্তলবণ তৈরি করে।

(ঙ) যকৃতে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের জারণের মাধ্যমে কিটোন বস্তু উৎপাদিত হয়।

৩। প্রোটিন বিপাক (Protein metabolism): যকৃত প্রোটিন বিপাকীয় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করে:

(ক) প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ (Synthesis of plasma proteins): যকৃত γ গ্লোবিউলিন ব্যতিত প্রায় সকল ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হলো: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, α_1 ফেটোপ্রোটিন এবং রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন, V, VII, IX, X, XII, XII.

(খ) হরমোন সংশ্লেষ (Synthesis of hormane): যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দ্বারা সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

(গ) ডিঅ্যামিনেশন (Deamination): মানবদেহ অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সঞ্চয় করতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো অ্যাসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো অ্যাসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) তৈরি করে। কিটো অ্যাসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি করে।

(ঘ) ইউরিয়া সৃষ্টি (Urea formation): অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত ক্ষতিকর পদার্থ যা দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে অরনিথিন চক্রে (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক হতে মূত্ররূপে দেহ হতে নিষ্কাশিত হয়।

৪। এনজাইম উৎপাদন (Enzyme metabolism): যকৃত ক্যাটালেজ (catalase) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম উৎপাদন করে। কোষে সঞ্চিত বিষাক্ত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ক্যাটালেজ এনজাইম দ্বারা ভেঙ্গে পানি ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। এছাড়ার ক্যাটালেজ এনজাইম দ্বারা মানুষের যকৃতে রক্তের অনেক বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হয়।

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ এনজাইম}} 2H_2O + O_2$$

৫। তাপশক্তি উৎপাদন (Heat energy production): যকৃতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত হয় এবং এতে প্রচুর তাপশক্তির উৎপাদন ঘটে। এছাড়া যকৃতে বিভিন্ন ধরনের জটিল বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, ফলে প্রচুর তাপশক্তি উৎপাদিত হয়। এসব তাপশক্তি রক্তবাহিত হয়ে সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হয় এবং দেহের তাপীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

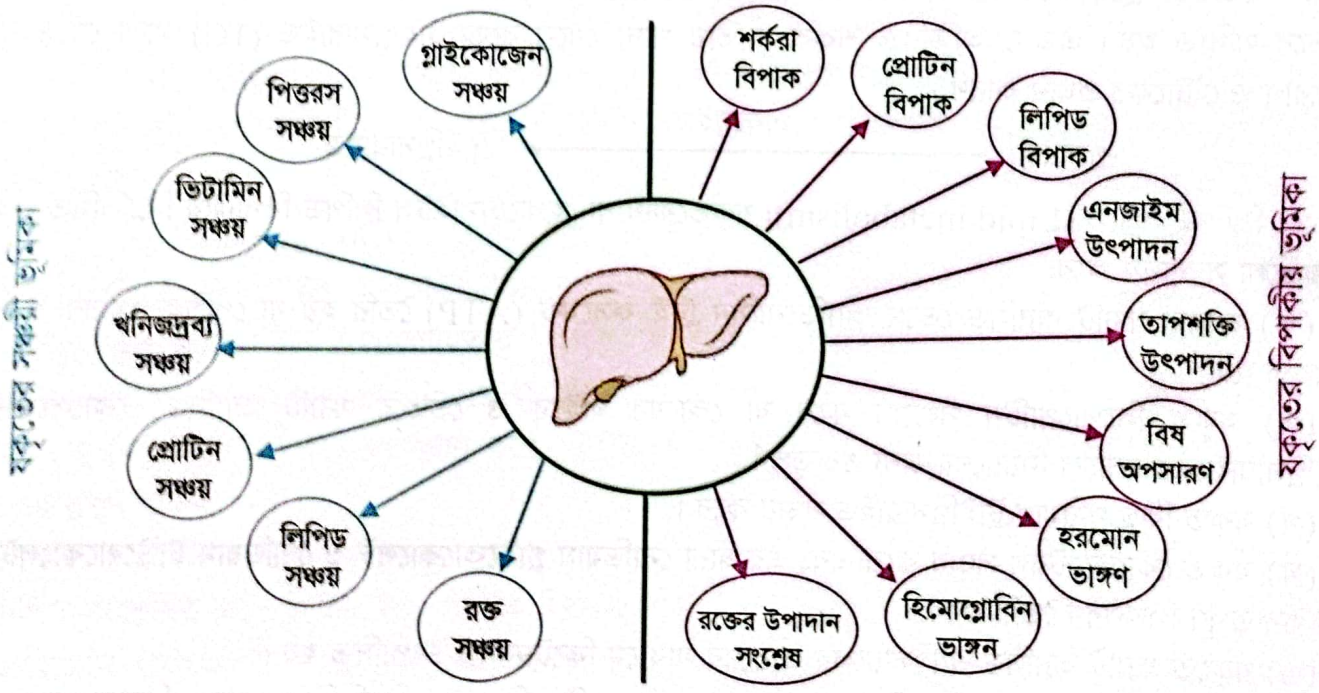

চিত্র: ৩.৯ মানুষের যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা

৬। বিষ অপসারণ (Detoxification): যকৃতের কোষসমূহ সর্বদা রক্তের উপাদান পর্যবেক্ষণ করে এবং দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌছানোর পূর্বেই রক্ত হতে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করে। যকৃতকোষের বিভিন্ন এনজাইম বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ, যেমন-অ্যালকোহল ও মাদকদ্রব্য ইত্যাদির বিপাক ঘটিয়ে এদের নিষ্ক্রিয় যৌগে পরিণত করে। যকৃতে ওষুধ বিপাক (drug metabolism) প্রক্রিয়ায় দেহে ব্যবহৃত অতিরিক্ত ওষুধ অপসারিত হয়।

৭। রক্তের উপাদান সংশ্লেষ (Synthesis of blood components): যকৃত রক্তের বিভিন্ন তঞ্চন ফ্যাক্টর, ইমিউন ফ্যাক্টর এবং লোহিত কণিকা সৃষ্টির কাঁচামাল উৎপাদন করে।

৮। হিমোগ্লোবিন ভাঙ্গন (Hemoglobin breakdown): যকৃতের কুপার কোষ সর্বদা রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার মৃত্যুর পর উহার হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে বিলিরুবিন (bilirubin) ও বিলিভার্ডিন (biliverdin) নামক রঞ্জক পদার্থ সৃষ্টি করে।

৯। হরমোন ভাঙ্গণ (Hormone breakdown): যকৃতে টেস্টোস্টেরন, অ্যালডোস্টেরন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, থাইরক্সিনসহ প্রায় সকল ধরনের হরমোনের ভাঙ্গণ ঘটে এবং এভাবে দেহে হরমোনের সাম্যবস্থা বজায় থাকে।

পিত্তরস (Bile or Gall)

যকৃত নিঃসৃত রসকে পিত্ত বা পিত্তরস বলে। এটি একটি গাঢ় সবুজ থেকে হলুদাভাব তরল। এটি তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় (pH: 7.50-8.605) তরল পদার্থ। যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে পিত্তথলিতে জমা থাকে যা খাদ্য পরিপাকে বিরতিহীনভাবে সরবরাহ হয়।

পিত্তরসের উপাদান : পিত্তরসে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে-

১। পানি: 97-98%;
২। অজৈব লবণ: 0.8%- সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন লবণ;
৩। পিত্ত লবণ: 6.0%- সোডিয়াম টাউরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট;
৪। পিত্ত রঞ্জক: 3% -বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন;
৫। কোলেস্টেরল: 0.38%;
৬। ফ্যাট: 0.82%।

পিত্তেরসের কাজ: পিত্তরস জীবনধারণের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। যদিও এতে কোনো এনজাইম নেই তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপাক রস। নিম্নে পিত্তরসের কাজ উল্লেখ করা হলো-

১। পরিপাক: পিত্তরস অন্ত্রে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন খাদ্য পরিপাকের জন্য অত্যাবশ্যক। পিত্তলবণ স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ইমালসিফিকেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে।

২। শোষণ: চর্বি, লৌহ ও ক্যালসিয়াম, চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ইত্যাদি শোষণের জন্য পিত্তলবণ অত্যাবশ্যক।

৩। রেচন: কপার, জিঙ্ক, লেড, টক্সিক পদার্থ, পিত্তরঞ্জক, ব্যাকটেরিয়া, লেসিথিন ইত্যাদি রেচন দ্রব্য পিত্তের মাধ্যমে দেহ হতে বহিষ্কার হয়।

৪। জোলাপ ক্রিয়া: পিত্তলবণ পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ায় উদ্দীপনা দেয়। এটি মলকে নরম করে।

৫। pH নিয়ন্ত্রণ: পিত্তরস ডিওডেনামের pH ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন এনজাইম ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

৬। বাফার ও লুব্রিকেন্ট: পিত্তরসের মিউসিন বাফার ও লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৭। মল নিষ্কাশন: পিত্তলবণ কোলনে পেরিস্ট্যালসিস বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

যকৃতের রোগ

- হেপাটাইটিস (Hepatitis): যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলে। সাধারণত যকৃত কোষে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এরোগ হয় এবং হেপাটাইটিস A, B, C, D ও E নামে চিহ্নিত করা হয়।
- হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি (Hepatic encephalopathy): যকৃত রক্তের বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে অক্ষম হলে সেগুলো রক্তে জমে গিয়ে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি সৃষ্টি করে। এর কারণে মানুষ কোমায় চলে যায়

অথবা মৃত্যুবরণ করে।

- বাড-কায়ারি সিনড্রম (Budd–Chiari syndrome): যকৃতে রক্ত সরবরাহকারী হেপাটিক শিরায় ব্লক সৃষ্টি হলে তাকে বাড-কায়ারি সিনড্রম বলে।
- প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস (Primary biliary cirrhosis): এটি যকৃতের একটি অটোইমিউন রোগ।
- হেপাটোমেগালি (Hepatomegaly): যকৃত অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে যাওয়াকে হেপাটোমেগালি বলে।
- যকৃত রোগের লক্ষণ:

হলুদাভ মল, গাঢ় বর্ণের মূত্র, জন্ডিস, হাঁটু-পা ও উদর ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ, যকৃতের উপরের দিকে ব্যথা অনুভব, ক্ষুধামন্দা, বদহজম ইত্যাদি।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অগ্ন্যাশয় পরিপাক ও অন্তঃক্ষরাতন্ত্রের একটি জটিল, মিশ্র প্রকৃতির গ্রন্থিময় অঙ্গ। এটি পাকস্থলির নিচে ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুণ্ডলির মাঝে অবস্থিত। এটি 12-15 সেন্টিমিটার লম্বা ও 5 সেন্টিমিটার চওড়া এবং দেখতে অনেকটা মরিচের মতো। এটি মস্তক, দেহ ও লেজ এ তিন অংশে বিভক্ত। সমগ্র অগ্ন্যাশয়টি যোজক কলার আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এ আবরণ অগ্ন্যাশয়ের ভেতরে প্রবেশ করে উহাকে কয়েকটি লোবিউলে বিভক্ত করে। অগ্ন্যাশয়ের এসব লোবিউলের মধ্যে দুই ধরনের গ্রন্থিকলা থাকে। এদের অধিকাংশই (90%) এনজাইম নিঃসরণকারী নালিযুক্ত গ্রন্থিকলা। অন্যগুলো (10%) হলো ফাঁকে ফাঁকে ও গুচ্ছাকারে অবস্থিত হরমোন ক্ষরণকারী অনাল গ্রন্থি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans)। আবিষ্কারক জার্মান শারিরত্ত্ববিদ পল ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Paul Langerhans, 1869) এর নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়।

অগ্ন্যাশয় একাধারে এনজাইম নিঃসরণ ও হরমোন ক্ষরণ করে বলে একে মিশ্র গ্রন্থি (mixed gland) বা হেটারোক্রাইন গ্ল্যান্ড (heterocrine gland) বলা হয়। অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালি বের হয়ে উইরসাং নালি (Wersaung canal) গঠন করে যা অগ্ন্যাশয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর এসে পিত্তনালির সাথে মিলিত হয় এবং সমন্বিতভাবে অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার (Amphula of Vater) এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

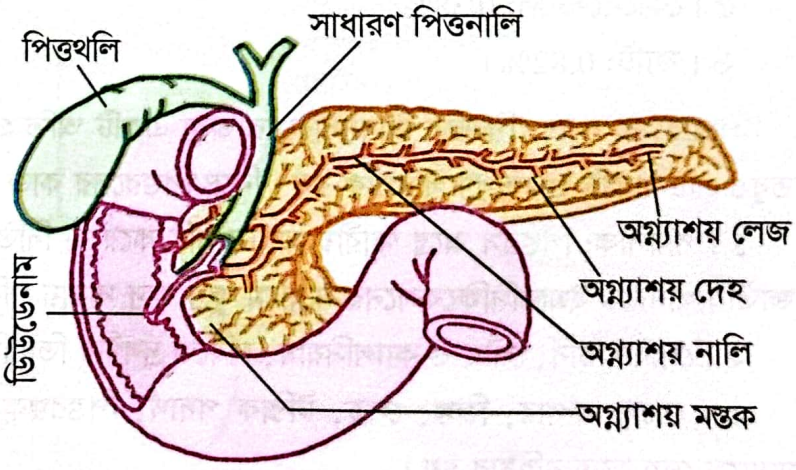

চিত্র: ৩.১০ মানুষের অগ্ন্যাশয়

সিলিয়াক ধমনী (coeliac artery) ও সুপিরিয়র মেসেন্টারি ধমনী (superior mesenteric artery) থেকে অগ্ন্যাশয়ে রক্ত বাহিত হয়।

অগ্ন্যাশয়ের কাজ (Functions of Pancreas)

অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এ গ্রন্থির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। এনজাইম নিঃসরণ: এ গ্রন্থির নালিযুক্ত অংশ থেকে খাদ্য পরিপাককারী প্রধান তিন ধরনের এনজাইম *ট্রিপসিন, লাইপেজ* ও *অ্যামাইলেজ* নিঃসৃত হয় যেগুলো যথাক্রমে আমিষ, স্নেহ ও শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে। এছাড়া এ গ্রন্থি থেকে কাইমোট্রিপসিন, কার্বক্সিপেপটাইডেজ, অ্যামিনোপেপটাইডেজ, ট্রাইপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ, ইরেপসিন, ইলাস্টেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ ইত্যাদি এনজাইম নিঃসৃত হয় যেগুলো বিভিন্ন ধরনের খাদ্য পরিপাক করে।

২। হরমোন ক্ষরণ: অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স প্রায় 10 লক্ষ কোষের একটি গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। কোষগুলো চার ধরনের হয়:

(ক) আলফা কোষ (α cells): মানব আইলেটসের প্রায় 20% কোষ হলো আলফা কোষ। এগুলো পেপটাইড ধরনের গ্লুকাগন (glucagon) হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (glucose level) বৃদ্ধি করে।

(খ) বিটা কোষ (β cells): মানব আইলেটসের 50-70% কোষ হলো বিটা কোষ। এরা ইনসুলিন (insulin) হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে। ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমায় অর্থাৎ রক্ত থেকে যকৃত, চর্বি ও কঙ্কালপেশিতে গ্লুকোজ শোষণ হার বৃদ্ধির মাধ্যমে শর্করা, স্নেহ ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের ইনসুলিন উৎপাদন কোনো কারণে বাধাগ্রস্থ হলে অথবা গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদনে ব্যর্থ হলে মানবদেহে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস (diabetes mellitus) বলে।

(গ) ডেল্টা কোষ (δ cells): মানব আইলেটসের সর্বোচ্চ 10% কোষ হলো ডেল্টা কোষ। পাকস্থলি ও অন্ত্রের প্রাচীরেও ডেল্টা কোষ পাওয়া যায়। এগুলো সোমাটোস্ট্যাটিন (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে যা আলফা ও বিটা কোষের হরমোন ক্ষরণ রোধ করে।

(ঘ) গামা কোষ (γ cells): মানব আইলেটসের মাত্র 3-5% কোষ হলো গামা কোষ। এরা প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide-PP) হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণ করে যা অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। লবণ নিঃসরণ: এ গ্রন্থির নালিযুক্ত অংশ থেকে বাইকার্বনেট লবণ নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলির অম্লতা লাগব করে।

৪। অন্যান্য কাজ: দেহের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, পানিসাম্যতা রক্ষা, তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজে অগ্ন্যাশয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juices)

অগ্ন্যাশয়ের নালিযুক্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক তরলকে অগ্ন্যাশয় রস বলে। উচ্চ মাত্রায় বাইকার্বনেট লবণ থাকার কারণে এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির।

অগ্ন্যাশয় রসের উপাদান

১। পানি: 98%।

২। জৈব বস্তু: 1.8%-ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ ইত্যাদি এনজাইম।

৩। অজৈব বস্তু: 0.2%-সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জিঙ্কের বাইকার্বনেট লবণ ইত্যাদি।

অগ্ন্যাশয় রসের কাজ

১। এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির হওয়ায় সম পরিমাণ পাকস্থলির অম্লীয় রসকে প্রশমিত করে।

২। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান *অ্যামাইলেজ, ম্যাল্টেজ, সুক্রেজ, ল্যাক্টেজ* এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৩। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান *ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, নিউক্লিয়েজ* এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

৪। অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান *লাইপেজ* এনজাইম স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric glands)

পাকস্থলির অন্তর্গাত্রের মিউকোসা স্তরে অসংখ্য এককোষী, সরল বা শাখান্বিত নলাকার গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী রস নিঃসরণ করে। এসব গ্রন্থিকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বলে। এসব গ্রন্থি পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত থাকে। অবস্থান অনুযায়ী

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি তিন প্রকারের যথা- (ক) ফান্ডাস অঞ্চলে বিস্তৃত ফান্ডিক গ্রন্থি (fundic glands), (খ) কার্ডিয়াক অঞ্চলে বিস্তৃত কার্ডিয়াক গ্রন্থি (cardiac glands) এবং (গ) পাইলোরি অঞ্চলে বিস্তৃত পাইলোরিক গ্রন্থি (pyloric glands)। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত:

১। প্যারাইটাল কোষ বা অক্সিনটিক কোষ (Parietal cells/Oxyntic cells): এরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর (intrinsic factor) ও বাইকার্বনেট নিঃসরণ করে।

২। গ্যাস্ট্রিক চিফ কোষ বা জাইমোজেনিক কোষ (Gastric chief cells/Zymogenic cells): এরা দুধরনের প্রোএনজাইম: *পেপসিনোজেন* ও *প্রোরেনিন* এবং দুধরনের এনজাইম: *গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ* ও *গ্যাস্ট্রিক অ্যামাইলেজ* নিঃসরণ করে। এসব কোষ নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির প্রোএনজাইম নিঃসরণ করে বলে এদেরকে জাইমোজেন (zymogen) বলা হয়।

৩। মিউকাস কোষ বা ফোভিওলার কোষ বা গবলেট কোষ (Mucous cells/Foveolar cells/Goblet cells): এরা পিচ্ছিল ক্ষারীয় মিউকাস নিঃসরণ করে।

৪। আর্জেন্টাফিন কোষ (Argentaffin cells): এরা সেরোটোনিন (serotonin) ক্ষরণ করে যা পাকস্থলিকে পেশি সংকোচনে উদ্দীপিত করে।

৫। গ্যাস্ট্রিন কোষ বা জি-কোষ বা অন্তঃক্ষরা কোষ (Gastrin cells/G cells/Endocrine cells): এরা পলিপেপটাইড হরমোন গ্যাস্ট্রিন (gastrin) ক্ষরণ করে যা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিকে এনজাইম ও HCl নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

৬। এন্টারোক্রোমাফিন কোষ (Enterochromaffin cells): এরা হিস্টামিন (histamine) নিঃসরণ ও সংরক্ষণ করে।

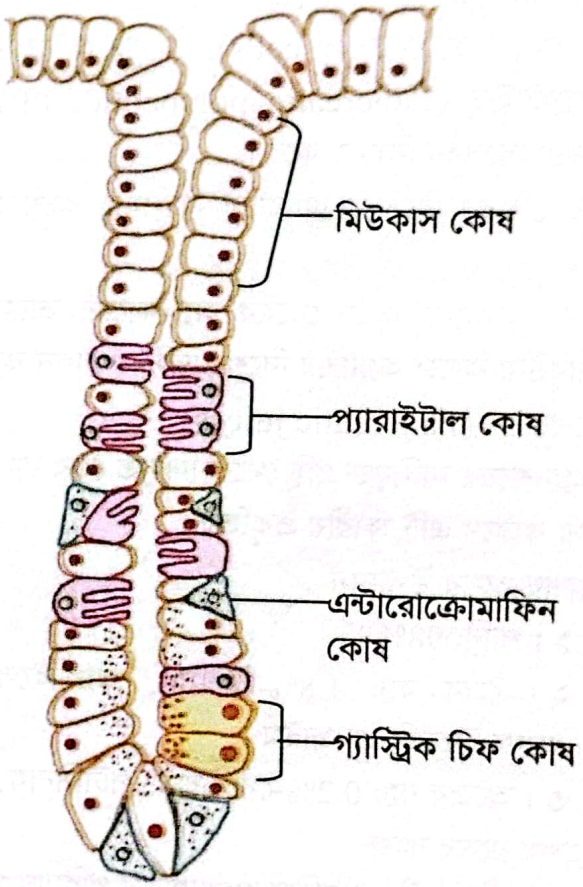

চিত্র: ৩.১১ গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

গ্যাস্ট্রিক রসের উপাদান

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিসমূহ থেকে নিঃসৃত তরল উপাদানসমূহকে সামগ্রিকভাবে তাকে গ্যাস্ট্রিক রস (gastric juices) বলে। মানুষের পাকস্থলিতে প্রতিদিন প্রায় দুই লিটার গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়। গ্যাস্ট্রিক রসের প্রধান উপাদান হলো:

১। পানি : 99.45%.

২। অজৈব পদার্থ: 0.15%- HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

৩। জৈব পদার্থ: 0.40%- মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক রসের কাজ

১। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান HCl (গ্যাস্ট্রিক রসে 0.05-0.3%) পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ (pH=1.2-1.8) সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান *পেপসিন* এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান *রেনিন* এনজাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।

৪। গ্যাস্ট্রিক রসে বিদ্যমান ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর ভিটামিন B_{12} শোষণের জন্য অত্যাবশ্যক।

৫। গ্যাস্ট্রিক রসের মিউকাস পাকস্থলির প্রাচীরকে সুরক্ষা করে যা না হলে পাকস্থলি নিজেই হজম হয়ে যেতো।

৬। কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালক্যালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক রসের সাথে দেহ হতে বহিষ্কৃত হয়।

আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands)

অন্ত্রের প্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম নিঃসরণ করে। এরা হলো- ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ (মিউকাস নিঃসরণ করে), প্যানেথ কোষ (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড ও প্রোটিন নিঃসরণ করে), আরজেন্টাফিন কোষ (সেরোটোনিন ক্ষরণ করে), লিবারকুন-এর গ্রন্থি (এনজাইম নিঃসরণ করে) এবং ব্রুনার-এর গ্রন্থি (ক্ষারীয় মিউকাস নিঃসরণ করে)। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস ইন্টারিকাস** (Intestinal juice or Succus entericus) বলে। এটি ক্ষারীয় প্রকৃতির রস এবং এর pH মান 6.5-7.5।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

১। **পানি:** 98.5%.

২। **অজৈব পদার্থ:** 0.8%- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

৩। **জৈব পদার্থ:** 0.7%, **সক্রিয়ক**–এন্টারোকাইনেজ; **এনজাইম**–ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ ও লাইপেজ ইত্যাদি।

আন্ত্রিক রসের কাজ

১। আন্ত্রিক রসে বিদ্যমান মিউকাস অন্ত্রের প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

২। এতে বিদ্যমান সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।

৩। এতে বিদ্যমান *মল্টেজ*, *সুক্রেজ* ও *ল্যাক্টেজ* এনজাইম যথাক্রমে মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

৪। এতে বিদ্যমান *পেপটাইডেজ* এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

মেমব্রেন এনজাইম (Membrane enzymes)

অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে কতগুলো এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে **মেমব্রেন এনজাইম** বলে। প্রধান মেমব্রেন এনজাইম হলো:

অ্যামিনোপেপটাইডেজ (aminopeptidase)-পেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

ম্যালটেজ (maltase)- ম্যালটোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

সুক্রেজ (sucrase)-সুক্রোজকে ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টেজ (lactase)-দুগ্ধ চিনি ল্যাক্টোজকে গ্লুকোজ ও গ্ল্যালাক্টোজে পরিণত করে।

মেমব্রেন এনজাইমের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য হলো **অ্যালকালাইন ফসফেটেজ** (alkaline phosphatase) যা বিভিন্ন ফসফেট যৌগকে ভাঙ্গে, **নিউক্লিউটাইডেজ** (nucleotidases) যা নিউক্লিউটাইডকে নিউক্লিউসাইডে পরিণত করে এবং **নিউক্লিউসাইডেজ** (nucleosidases) যা নিউক্লিউসাইডকে চিনি, পিউরিন ও পাইরিমিডিন-এ পরিণত করে।

পরিপাক ও শোষণের মধ্যে পার্থক্য

পরিপাক	শোষণ
১। পরিপাক প্রক্রিয়ায় বৃহদাকৃতির জটিল খাদ্য যান্ত্রিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় ভেঙ্গে সরল ও শোষণ উপযোগী খাদ্যসারে পরিণত হয়।	১। শোষণ প্রক্রিয়ায় সরল খাদ্যসার পরিপাক নালি হতে রক্তে প্রবেশ করে।

২। পরিপাক প্রক্রিয়া মুখবিবর, পাকস্থলি ও অন্ত্রের গহ্বরে সংঘটিত হয়।	২। শোষণ প্রক্রিয়া অন্ত্রের ইলিয়াম ও জেজুনামের ভিলাইযে সংঘটিত হয়।
৩। পরিপাক প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয়।	৩। শোষণ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের প্রয়োজন হয় না।
৪। পরিপাক সর্বদাই একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এতে জৈব শক্তির প্রয়োজন হয়।	৪। শোষণ একটি নিষ্ক্রিয় ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং এতে কোন জৈব শক্তির প্রয়োজন হয় না।
৫। পরিপাকে খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।	৫। শোষণে খাদ্যের গাঠনিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না।
৬। পরিপাকে রক্তের কোনো প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই।	৬। শোষণে রক্তের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা আছে।
৭। কেবল বৃহৎ ও জটিল পাচক দ্রব্যের উপর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।	৭। সরল প্রকৃতির পাচক ও অপাচক উভয় ধরনের দ্রব্যের শোষণ প্রক্রিয়া ঘটে।

এনজাইম ও হরমোনের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	হরমোন
১। সনাল গ্রন্থি থেকে কিংবা কোষাভ্যন্তরে নিঃসৃত হয়।	১। অনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়।
২। উৎসের নিকটবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।	২। উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে ক্রিয়া করে।
৩। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে শর্ত সাপেক্ষে অপরিবর্তিত থাকে।	৩। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং বিক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৪। কাজের গতি দ্রুত ও ফলাফল তাৎক্ষণিক।	৪। কাজের গতি মন্থর ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী।
৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া উভমুখী।	৫। রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী।
৬। নালি দ্বারা পরিবাহিত হয়।	৬। রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়।
৭। কোষ আবরণী দিয়ে এদের ব্যাপন ঘটে না।	৭। কোষ আবরণী দিয়ে এদের ব্যাপন ঘটে।
৭। উদাহরণ : ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।	৭। উদাহরণ: গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইনসুলিন ইত্যাদি।

এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	পিত্তরস
১। এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	১। পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ।
২। এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	২। পিত্তরস পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩। এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না।	৩। পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে।
৪। এনজাইমের কার্যক্ষেত্র সমগ্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।	৪। পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ।
৫। এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৫। পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে।
৬। এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৬। পিত্তরস কার্যশেষে বর্জ্যরূপে দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

৩.৩ খাদ্য পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা
(Roles of Nervous System and Hormone in Food Digestion)

(ক) স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত ক্ষুধা কেন্দ্র (hunger centers) মানুষের ক্ষুধা ও খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের গ্লুকোজ মাত্রা কমে গেলে মানুষ খাদ্যগ্রহণে উদ্দীপিত হয়। দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ু মানুষের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদেরকে **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক বা ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Intrinsic plexuses) ও **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক বা এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাস** (Extrinsic plexuses) বলে।

❑ **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** (Intrinsic plexuses): পরিপাকতন্ত্রের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসকে এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্র (enteric nervous system) বা **অন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। এগুলো পৌষ্টিকনালির অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রাচীরে ঘন সন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থাকে। এগুলো পৌষ্টিকনালির ভেতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। দুই ধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস পরিপাকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের একটি হলো **মায়েনটারিক প্লেক্সাস** (myenteric plexus) যা পরিপাকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সঙ্কোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি হলো **সাবমিউকোসাল প্লেক্সাস** (submucosal plexus) যা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্র খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে।

❑ **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** (Extrinsic plexuses): এগুলো পৌষ্টিকনালির বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা পরিপাকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- যেমন খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে কিংবা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেয়া। এক্সট্রিনসিক স্নায়ুগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (autonomic nervous system) সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক শাখা হতে আসে। এরা অ্যাসিটালকোলিন (acetylcholine) এবং অ্যাডরেনালিন (adrenaline) নামক রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত করে। অ্যাসিটালকোলিন পৌষ্টিকনালির ভেতর দিয়ে খাদ্য এবং পানীয় দ্রুত প্রবাহিত হতে শক্তি প্রয়োগ করে। এছাড়া এটি পাকস্থলি ও অগ্ন্যাশয় হতে অধিক পরিমাণ পাচক রস নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে। অ্যাডরেনালিন পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশিকে শিথিল করে এবং এসব অঙ্গে রক্ত প্রবাহ মন্থর করে।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের বৃহদন্ত্রের প্রাচীরে বিদ্যমান স্নায়ুজালিকা খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্রকে বিজ্ঞানীগণ মানুষের **দ্বিতীয় মস্তিষ্ক** (second brain) নাম দিয়েছেন। কেননা এটি একদিকে যেমন মস্তিষ্কে উদ্দীপণা প্রেরণে সক্ষম অন্যদিকে তেমনি পরিপাকতন্ত্রের হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিপাকনালিতে খাদ্য চলাচল, মানুষের ক্ষুধা ও তৃপ্তি অনুভব ইত্যাদি অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম। বর্তমানে **Neurogastroenterology** চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি আধুনিক শাখা যেখানে মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক কীভাবে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে সে বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

(খ) হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হরমোন ক্ষরণ ব্যহত হলে পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা ঘটে। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন বা জি আই হরমোন (gastrointestinal or GI hormones) নামে পরিচিত। এগুলো রক্তে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রে বিভিন্ন রক্তনালি দিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে এবং সেখান থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে ফিরে আসে যেখানে এরা বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কার্যকে উদ্দীপিত করে। খাদ্যের পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলো হলো:

১। গ্যাস্ট্রিন (Gastrin): পাইলোরিক পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিন কোষ (G-cells) হতে গ্যাস্ট্রিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলির প্রাচীর হতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। এছাড়া পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের অন্তঃআবরণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ হরমোনের ক্ষরণ অপরিহার্য।

২। সিক্রেটিন (Secretin): অন্ত্রের প্রাচীর থেকে সিক্রেটিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। এছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

৩। কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin- CCK): ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে কোলেসিস্টোকাইনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। খাদ্যে চর্বির উপস্থিতিতে উদ্দীপিত হয়ে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি পিত্তথলি থেকে পিত্তরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে।

৪। এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin): ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এ হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে *মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ* ও *ল্যাকটেজ* এনজাইম নিঃসৃত হয়। এটি পিত্তথলি থেকে পিত্তরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে।

৫। পেপটাইড YY (Peptide YY): ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৬। গ্যাস্ট্রিক ইনহ্যাবিটরি পেপটাইড (Gastric inhibitory peptide -GIP): ডিউডেনামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পাকস্থলি থেকে খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ইনসুলিন হরমোন ক্ষরণের সূচনা ঘটায়।

৭। সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin): ডিউডেনামের প্রাচীরের ডেল্টা কোষ (δ cells) থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি প্যারাইটাল কোষের উপর ক্রিয়া করে এদের অ্যাসিড ক্ষরণ হ্রাস করে।

৮। প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic polypeptide=PP): অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ গুচ্ছের PP কোষ থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এ হরমোন অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এটি যকৃতে গ্লাইকোজেন মাত্রা ও পাকস্থলি-অন্ত্রের নিঃসরণকে প্রভাবিত করে।

৯। ভিল্লিকাইনিন (Villikinin): ক্ষুদ্রান্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি ভিলাইয়ের সঞ্চালনকে ত্বরান্বিত করে।

১০। ডিওক্রিনিন (Deocrinin): ডিওডেনামের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি আন্ত্রিক রসে মিউকাস ও এনজাইম নিঃসরণের জন্য ব্রুনারের গ্রন্থিকে (Brunner's glands) উদ্দীপিত করে।

১১। এন্টেরোক্রিনিন (Enterocrinin): ডিওডেনামের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি আন্ত্রিক রসে মিউকাস ও এনজাইম নিঃসরণের জন্য লিবারকুন গ্রন্থিকে (Crypts of Liberkuhn) উদ্দীপিত করে।

১২। ভেসোয়াকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (Vasoactive intestinal peptide-VIP): ক্ষুদ্রান্ত্রের এপিথেলিয়াম প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অন্ত্রের প্রাচীরের রক্ত জালিকাগুলোকে প্রসারিত করে এবং গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণ বন্ধ করে।

ক্ষুধা ও তৃপ্তি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন

কতিপয় GI পেপটাইড যেমন-ভেসোয়াকটিভ ইনটেস্টাইনাল পেপটাইড (VIP), গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড-1 (GLP-1), প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (PP), গ্যাস্ট্রিক ইনহ্যাবিটরি পেপটাইড (GIP), গ্রিলিন (ghrelin) এবং পেপটাইড YY মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে গ্রিলিন, PP এবং PYY সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রকের কাজ করে। খাদ্যগ্রহণের পূর্বে রক্তে গ্রিলিন (ghrelin) হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে ক্ষুধার (appetite) উদ্রেগ হয়। অন্যদিকে খাদ্য গ্রহণের সময় রক্তে PP এবং PYY হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে খাবারে তৃপ্তি (satiety) আসে।

৩.৪ বৃহদান্ত্রের কাজ (Function of Large Intestine)

মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পেছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে বৃহদান্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 1.5 মিটার। এটি প্রধান দুই অংশে বিভক্ত। এর সামনের U আকৃতির বৃহৎ অংশকে কোলন (collon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশকে মলাশয় (rectum) বলে। কোলন চারটি অংশে বিভক্ত, যথা- ঊর্ধ্বমুখী, তির্যক, নিম্নমুখী ও সিগময়েড অংশ। ইলিয়াম ও কোলনের সংযোগস্থলে সিকাম (caecum) নামক একটি বৃহৎ থলি বিদ্যমান। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের প্রক্ষেপন যুক্ত থাকে। একে অ্যাপেনডিক্স (appendix) বলে। বৃহদান্ত্রের রেকটাম প্রায় 12 সেন্টিমিটার লম্বা। এটি পায়ু ছিদ্র (anus) দ্বারা বাইরে উন্মুক্ত হয়। পায়ুছিদ্র কতগুলো ঐচ্ছিক প্রকৃতির স্ফিংটার পেশি দ্বারা বেষ্টিত থাকে যেগুলো মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের বৃহদান্ত্র প্রধান চারটি কাজ সম্পন্ন করে। যথা-

১। শোষণ ও পুনঃশোষণ: এখানে পানি ও কিছু খনিজলবণ আয়ন, যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরাইড শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্যে বিদ্যমান পানির প্রায় 70-80% বৃহদান্ত্রের কোলনে পুনঃশোষিত হয়।

২। মল উৎপাদন: ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে তরল কাইম বা মন্ড (প্রায় 350 গ্রাম) বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে এবং শোষণের মাধ্যমে প্রায় 135 গ্রাম আর্দ্র ও নরম মল তৈরি হয়ে সাময়িকভাবে জমা থাকে।

৩। গাঁজন ও পাচন: বৃহদান্ত্রে খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন ও পাচন ঘটে। এখানে প্রায় 500 প্রজাতির মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া থাকে যেগুলো খাদ্যের অপাচ্য অংশের গাঁজন (fermentation) ঘটায়।

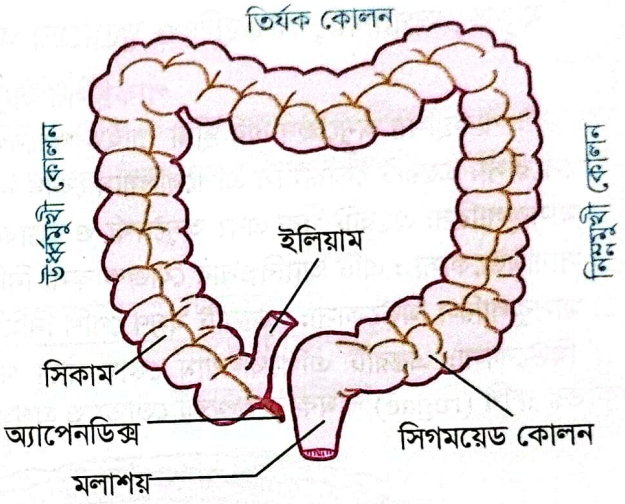

চিত্র ৩.৮ বৃহদান্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৪। অণুজীবের ভাণ্ডার: বৃহদান্ত্রের অ্যাপেনডিক্সকে উপকারি অণুজীবের সুরক্ষিত ভাণ্ডার বলা হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে আমাশয় বা কলেরা বা অন্য কোন অপকারি জীবাণু দ্বারা অন্ত্রের উপকারি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হলে অ্যাপেনডিক্সের উপকারি ব্যাকটেরিয়াগুলো অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার জীবগোষ্ঠিকে (gut flora) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে বৃহদান্ত্রে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া আমাদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন পরিণত মানুষের কোলনে বসবাসকারী প্রায় 500 প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব ব্যাকটেরিয়া অ্যানঅ্যারব (anaerobe) প্রকৃতির অর্থাৎ এরা অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এরা বৃহদান্ত্রে কিছু অপাচ্য খাদ্য উপাদানকে গাঁজন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড (short-chain fatty acids=SCFAs) উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস মুক্ত করে। এসব ক্ষুদ্র শিকল ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন-অ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপাওনিক অ্যাসিড ও বিউটারিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া এবং কোলনের প্রাচীরের কোষে শক্তি সরবরাহ করে।

মলত্যাগ বা ডেফিকেশন (Defecation)

যে প্রক্রিয়ায় পরিপাক নালি হতে খাদ্যের অর্ধ-কঠিন বা নরম পরিপাক বর্জ্য মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে মলত্যাগ বা ডেফিকেশন বা **bowel movement** বলে। মানুষ প্রতিদিন এক থেকে দুইবার কিংবা কয়েকবার এমনকি সপ্তাহে তিনবার মলত্যাগ করে থাকে। কোলন পেশির সংকোচনী ঢেউ বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ায় মল জাতীয় পদার্থ বৃহদান্ত্র থেকে রেকটাম বা মলাশয়ে প্রেরিত হয়। বৃহদান্ত্রের প্রাচীর থেকে নিঃসৃত পিচ্ছিল মিউকাস পদার্থ লুব্রিকেন্টের মতো মল নির্গমনকে সহজ করে। মলাশয় একটি সংকোচন-প্রসারণক্ষম পেশিময় নল যা মলের অস্থায়ী আধার হিসেবে কাজ করে। মল দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় মলাশয় পূর্ণ হলে এর প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাতে

ডেফিকেশন প্রতিবর্তী ক্রিয়া (defecation reflex) ঘটে এবং মল ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। এ ধরনের ক্রিয়া দুই থেকে তিন মিনিট থাকে এবং এসময়ের মধ্যে মলত্যাগ না করলে অনেকক্ষেত্রে মল কোলনে ফিরে যায়। দীর্ঘসময় মল চেপে রাখলে কোলনের প্রাচীর দ্বারা মলের পানি পুনঃশোষিত হয় এবং মল শক্ত হয়ে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দেখা দেয়। মল দ্বারা মলাশয় পরিপূর্ণ হলে এর প্রাচীরে অভ্যন্তরীন চাপ বৃদ্ধি পায়। মলাশয় প্রাচীরের অন্তঃচাপ এবং পেলভিক পেশির যুগপৎ ক্রিয়ায় মল পায়ুনালিতে প্রবেশ করে। মলাশয়ের সংকোচন এবং পায়ুনালির পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়ায় মল পায়ুপথে দেহের বাইরে নির্গত হয়। তবে পায়ুনালির ভেতরে অবস্থিত দুটি স্ফিংটার পেশি (sphincter muscle) মলকে বাইরে নির্গমণ করা বা না করা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাথা, ভয়, তাপমাত্রা, শারীরিক কিংবা স্নায়বিক জটিলতা মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

৩.৫ ব্যবহারিক

যকৃত, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পাকস্থলির অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ: পাকস্থলির অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর দেখা যায়-

- ❑ সেরোসা: এস্তরটি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত।
- ❑ মাসকুলারিস: এস্তরটি পুরু এবং অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি দিয়ে গঠিত।
- ❑ সাবমিউকোসা : এটি অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত এবং এতে রক্তনালি ও স্নায়ুতন্তু বিদ্যমান থাকে।
- ❑ মাসকুলারিস মিউকোসা: এস্তরটি মসৃণ পেশি নির্মিত এবং ঢেউ খেলানো।
- ❑ মিউকোসা: এস্তরটি এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। এতে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে। এ স্তর থেকে Y আকৃতির রুগি (rugae) নামক কতগুলো ভোঁতা ও প্রশস্ত অভিক্ষেপ বের হয়ে পাকস্থলির লুমেনে প্রক্ষিপ্ত থাকে।

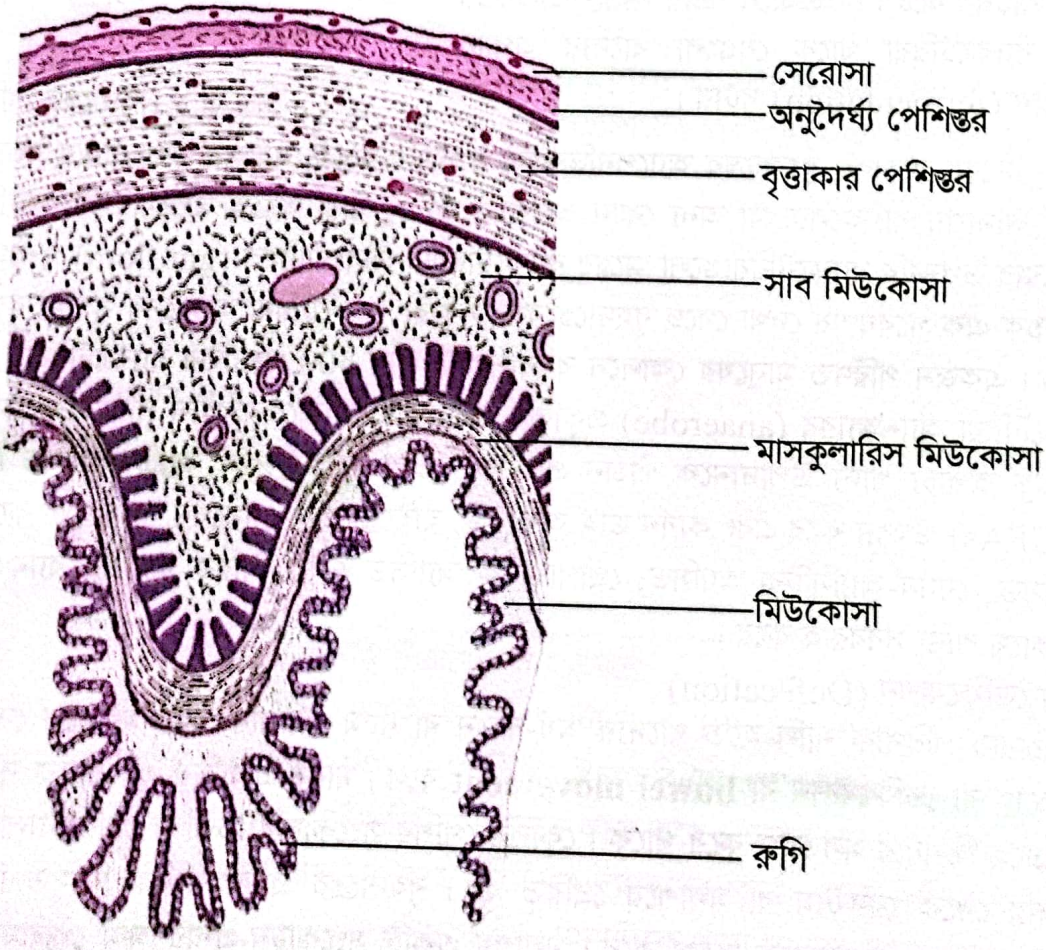

চিত্র ৩.৯ পাকস্থলির অনুচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। পাকস্থলির প্রাচীরে সেরোসা, মাসকুলারিস, সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর নামক পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর বিদ্যমান।

২। Y আকৃতির ভোঁতা ও প্রশস্ত অভিক্ষেপ রুগি (rugae) বিদ্যমান।

৩। মিউকোসা স্তরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি বিদ্যমান।

অন্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ: অন্ত্রের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর দেখা যায়-

- সেরোসা: এস্তরটি স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত।
- মাসকুলারিস: এটি তুলনামূলক পাতলা এবং অনুদৈর্ঘ্য ও বৃত্তাকার পেশি দিয়ে গঠিত।
- সাবমিউকোসা: এটি অ্যারিওলার যোজক কলা নির্মিত এবং এতে রক্তনালি ও স্নায়ুতন্তু বিদ্যমান।
- মাসকুলারিস মিউকোসা: এস্তরটি মসৃণ পেশি নির্মিত এবং ঢেউ খেলানো।
- মিউকোসা: এস্তর এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে গবলেট কোষ ও শোষণক্ষম কোষ বিদ্যমান থাকে।
- ভিলাই: অন্ত্রের সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর মিলে অন্ত্রের লুমেনে ভিলাই (villi) নামক আঙ্গুলের মতো সরু কতগুলো অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে।

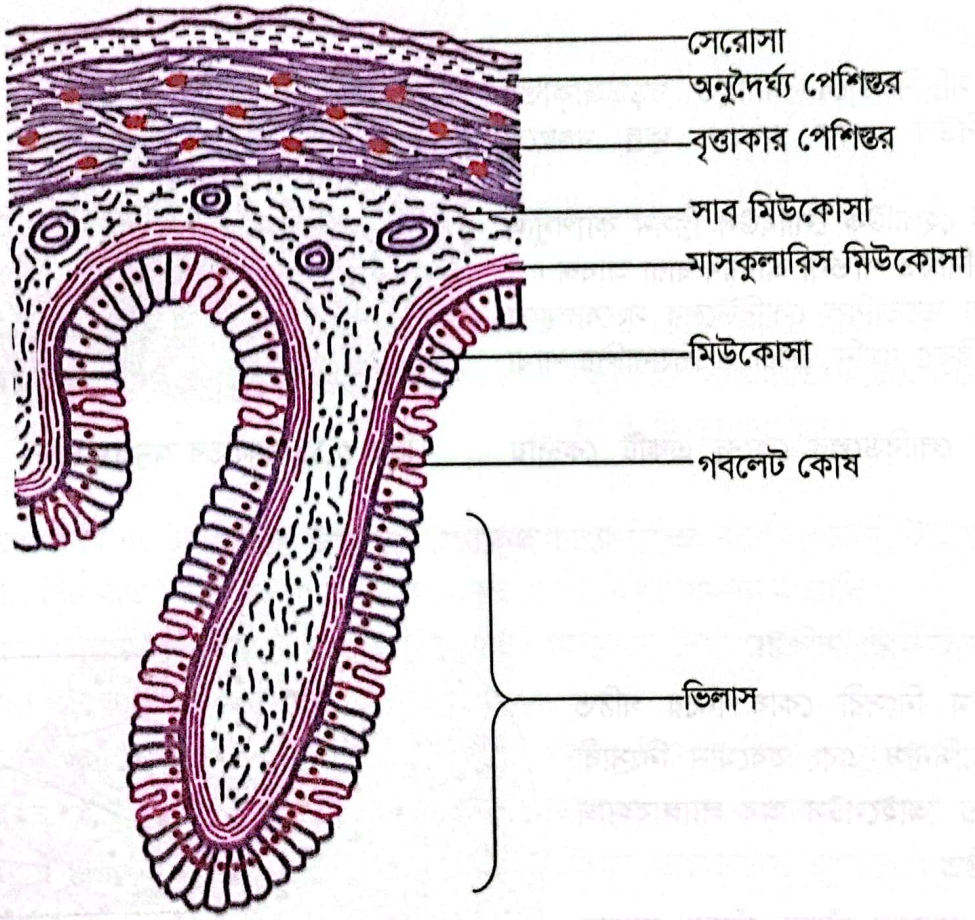

চিত্র ৩.১০ অন্ত্রের অনুচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। অন্ত্রের প্রাচীরে সেরোসা, মাসকুলারিস, সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর নামক পর্যায়ক্রমিক পাঁচটি স্তর বিদ্যমান।

২। অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে ভিলাই নামক আঙ্গুলের মতো সরু কতগুলো অভিক্ষেপ বিদ্যমান।

৩। মিউকোসা স্তরে গবলেট কোষ ও শোষণক্ষম কোষ বিদ্যমান।

যকৃতের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ

❑ যকৃত গ্লিসন ক্যাপস্যুল (Glisson's capsule) নামক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটি যকৃতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যকৃতকে হেপাটিক লোবিউল (hepatic lobules) নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে।

❑ প্রতিটি লোবিউল ষড়ভূজাকৃতির কিংবা প্রিজম আকৃতির এবং গ্লিসন ক্যাপস্যুল ও যোজক কলা নির্মিত পাতলা আবরণ দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

❑ দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক কলা পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিত্তনালির শাখা থাকে।

❑ লোবিউলগুলোর ভেতরে অসংখ্য বহুভূজাকৃতির হেপাটিক কোষ থাকে যেগুলো সারিবদ্ধভাবে হেপাটিক কর্ড (hepatic cord) গঠন করে একটি কেন্দ্রকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত থাকে।

❑ হেপাটিক কর্ডের ফাঁকে ফাঁকে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামে ফাঁকা স্থান এবং রক্ত ক্যানালিক্যুলি বিদ্যমান থাকে।

❑ সাইনুসয়েডগুলো কুফার'স কোষ (Kupffer's cells) দ্বারা আবৃত থাকে।

❑ প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে।

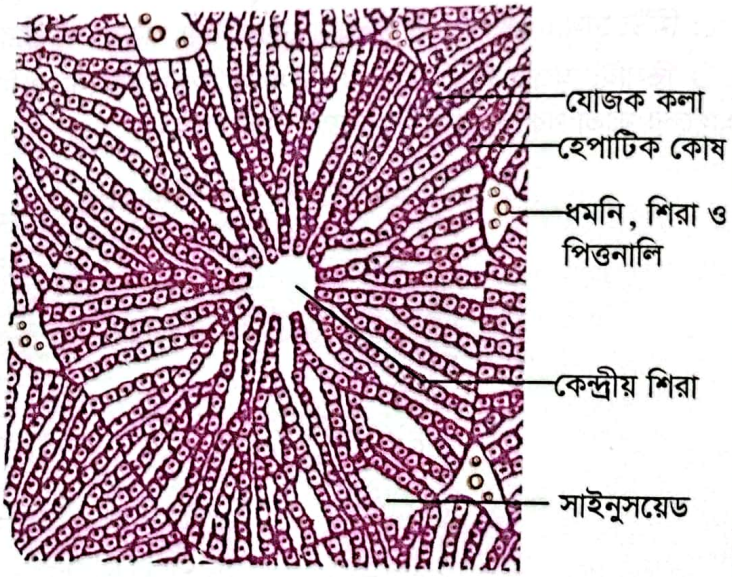

চিত্র ৩.১১ যকৃতের অনুপ্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থিত ষড়ভূজাকৃতির হেপাটিক লোবিউল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ডাংশে বিদ্যমান।

২। প্রতিটি হেপাটিক লোবিউল গ্লিসন ক্যাপস্যুল ও যোজক কলা নির্মিত পাতলা আবরণ দ্বারা আবদ্ধ।

৩। দুই বা ততোধিক লোবিউলের সংযোগস্থলে যোজক কলা পরিবৃত্ত ধমনি, শিরা ও পিত্তনালির শাখা বিদ্যমান।

৪। প্রতিটি লোবিউলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা থাকে।

অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ এর স্থায়ী স্লাইড

পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১। এনজাইম নিঃসরী কোষ নিয়ে গঠিত লোবিউল বা অ্যাসিনাস এবং হরমোন নিঃস্রাবী কোষ নিয়ে গঠিত 'আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নিয়ে অগ্ন্যাশয় গঠিত।

২। এ দুই অংশের ফাঁকে ফাঁকে যোজক কলা, রক্তনালিকা ও অগ্ন্যাশয় অণুনালিকা বিদ্যমান থাকে।

৩। প্রতিটি অ্যাসিনাসের কেন্দ্রে একটি লুমেন থাকে।

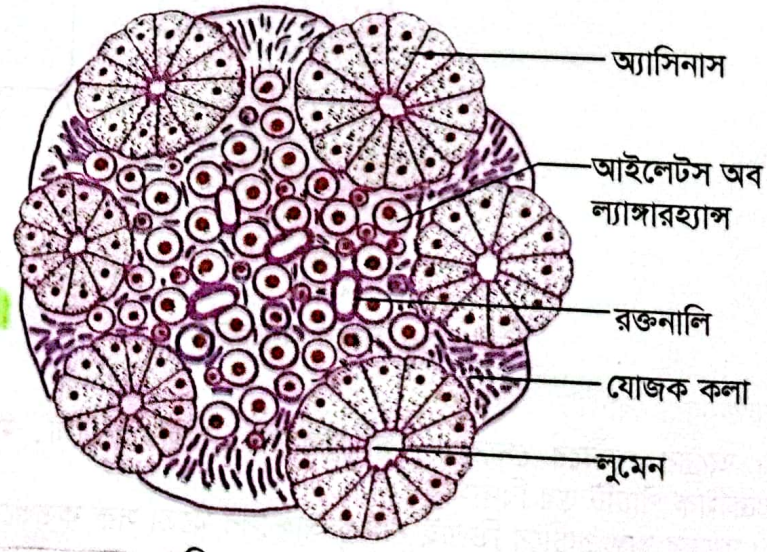

চিত্র ৩.১২ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

৩.৬ স্থূলতা (Obesity)

স্থূলতা এক ধরনের স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাতে দেহের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হয়ে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবনকাল হ্রাস করে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেসব মানুষের দেহ ভর সূচক (Body Mass Index =BMI) 30 কেজি/বর্গমিটারের অধিক হয় তারা স্থূল প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বব্যাপি মানুষের স্থূলতার মান নির্ণয়ে দেহভর সূচক বা BMI মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়। বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী দেহের মোট ওজনকে উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে BMI বলা হয়। অর্থাৎ-

$$\text{বিএমআই} = \frac{\text{কিলোগ্রাম}}{\text{বর্গমিটার}} \qquad \text{BMI} = \frac{\text{kilograms}}{\text{meters}^2}$$

এ হিসেবে 160 সেন্টিমিটার (1.6 মিটার) উচ্চতা ও 74 কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে প্রায় 29। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization =WHO) 2000 সালে বিএমআই এর নিম্নলিখিত মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে যা দ্বারা খুব সহজেই মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়।

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	$< 18.5\ Kg/m^2$	শরীরের ওজন কম
2	$18.5\text{- }24.9\ Kg/m^2$	স্বাভাবিক ওজন (2)
3	$25.0\text{-}29.9\ Kg/m^2$	অতিরিক্ত ওজন (3)
4	$30.0\text{-}34.9\ Kg/m^2$	স্থূলতার ১ম স্তর (4)
5	$35.0\text{-}39.9\ Kg/m^2$	স্থূলতার ২য় স্তর (5)
6	$\geq 40.0\ Kg/m^2$	স্থূলতার ৩য় স্তর (6)

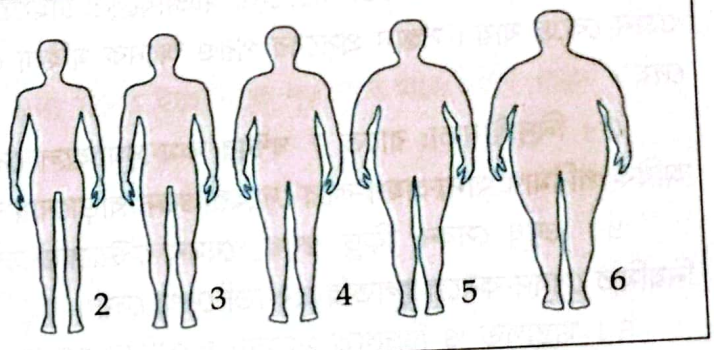

এশিয়ার মানুষের স্থূল (obese) হওয়ার প্রবণতা ইউরোপিয়ানদের চেয়ে কম। সাধারণত এশিয়ার মানুষের বিএমআই মান কম থাকে। এজন্য এশিয়ার অনেক দেশে স্থূলতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। যেমন, জাপান ও চীনে বিএমআই মান যথাক্রমে 25 Kg/m^2 ও 28 Kg/m^2 এর বেশি হলেই স্থূলতা ধরা হয়।

স্থূলতার স্বাস্থ্যগত সমস্যা

১। স্থূলতার কারণে মানুষ 60টির অধিক ক্রণিক রোগে আক্রান্ত হয় বিশেষ করে হৃৎরোগ, টাইপ-2 ডায়াবেটিস, কয়েক প্রকার ক্যানসার, গিট বাত, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির সমস্যা ইত্যাদি।

২। স্থূলতার কারণে মানুষের গড় আয়ু 7-8 বছর কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে অতিমাত্রায় স্থূলতার (স্থূলতার ৩য় স্তর) কারণে মানুষের গড় আয়ু 10 বছর কমে যায়।

৩। স্থূলতা বিশ্বব্যাপি মানুষের মৃত্যুর একটি প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। যুক্তরাষ্ট্রে স্থূলতার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে 1.5-3.6 লক্ষ লোক মারা যায়। ইউরোপে এ সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ।

৪। ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে 64% পুরুষ এবং 77% মহিলার ডায়াবেটিস স্থূলতার সাথে সম্পর্কিত বলে গবেষকগণ প্রমাণ পেয়েছেন।

৫। একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে শিশু ও বয়স্ক স্থূল মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। আমেরিকার 2 থেকে 19 বছর বয়সের শিশুদের 17% এর এবং বয়স্কদের বিশেষ করে 40 থেকে 59 বছর বয়সের 36.5% মানুষে স্থূলতা দেখা যায়।

৬। অসুস্থতা, অক্ষমতা এবং কম বয়সে মৃত্যুর কারণে স্থূলাকৃতির মানুষ অস্থূলাকৃতির মানুষ অপেক্ষা কম কর্মদিবস কাজ করতে পারে।

স্থূলতার কারণ

মানুষের স্থূলতার জন্য একাধিক প্রভাবকের সমন্বিত ক্রিয়াকে দায়ী করা হয়। যেসব প্রভাবক স্থূলতার জন্য দায়ী সেগুলো হলো:

১। খাদ্যাভ্যাস: (i) অতিরিক্ত চর্বি ও ক্যালরিযুক্ত খাবার গ্রহণ করা; (ii) অতিরিক্ত ফাষ্ট ফুড খাওয়া; (iii) বিশেষ দিনের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করা; (iv) প্রতিদিন স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণে খাওয়া; (v) অতিমাত্রায় তরল পানীয় পান করা।

২। জীবন যাত্রা প্রণালী: (i) অলস ও আয়েসী জীবন যাপন; (ii) উপার্জনের অধিকাংশ অর্থ খাবার খেয়ে ব্যয় করা; (iii) তরুণ-তরুণীদের বাড়ির বাইরে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ; (iv) নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা; (v) কায়িক পরিশ্রম নেই এমন চাকুরী করা (ডেস্ক জব)।

৩। শিক্ষার অভাব: (i) স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা; (ii) ভালো খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা; (iii) ধারণার অভাবে বাচ্চাদের মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ানো; (iv) খাবারের প্রতি সামাজিক আকর্ষণ; (v) সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৪। গর্ভধারণ: গর্ভবতী মায়েদের স্বাভাবিকের চাইতে বেশি খাবার গ্রহণ করতে হয়। এতে গর্ভকালীন সময়ে দেহের ওজন বেড়ে যায়। সন্তান প্রসবের পরও অনেক মহিলা এ অতিরিক্ত ওজন আর কমাতে পারে না। ফলে স্থূলতা দেখা দেয়।

৫। নিদ্রাহীনতা: রাতে 7 ঘণ্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধাগ্রতা বেড়ে যায় ফলে অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে দেহের ওজন বাড়ানোয় ভূমিকা রাখে।

৬। ওষুধ সেবন: কিছু ওষুধ, যেমন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ এবং বিষন্নতা বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ নিয়মিত সেবন করলে স্থূলতার প্রবণতা দেখা দেয়।

৭। স্বাস্থ্যগত ও জিনগত সমস্যা: অনেকক্ষেত্রে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা, নিম্ন বিপাক হার প্রভৃতি স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং জিনগত সংবেদনশীলতা মানুষের স্থূলতার কারণ হয়ে দাড়ায়।

৮। অসুখজনিত কারণ: হাইপোথাইরয়েডিজম (hypothyroidism), কুসিং সিনড্রোম (Cushing syndrome), পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (polycystic ovary syndrome), প্রাদার-উইলি সিনড্রোম (Prader-Willi syndrome) প্রভৃতি অসুখজনিত কারণে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

স্থূলতা প্রতিরোধ/নিয়ন্ত্রণের উপায়

১। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম: স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের প্রধান চিকিৎসা হলো খাবার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়াম। অতিরিক্ত লবণ, মিষ্টি ও চর্বি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব পরিহার করে প্রতিদিন আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। বেশি পরিমাণ ফল-মূল, শাক-সবজি, ডাল, বাদাম ইত্যাদি খেতে হবে। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা শরীরের ওজন কমানো যায়। নিয়মিত হাটার অভ্যাস করতে হবে।

২। ওষুধ সেবন: ক্ষুধা কমানোর কিংবা চর্বি শোষণ রোধ করে এমন ওষুধ সেবন করে স্থূলতা রোধ করা যায়। তবে নিজে নিজে ওষুধ সেবন করা যাবে না। ওষুধ ব্যবহারের জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FDA কর্তৃক অনুমোদিত Orlistat (Xenical), Phentermine (Suprenza), Lorcaserine (Belviq) ওষুধ বর্তমানে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। GI হরমোন ব্যবহার: সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিছু গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন বা GI হরমোনের ব্যবহার স্থূলতাকে দ্রুত হ্রাস করে। ফলে বিশ্বের স্থূলতা সংকট দূরীকরণে এসব হরমোন ম্যাজিক বুলেট (magic bullet) হিসেবে কাজ করছে।

৪। গ্যাস্ট্রিক বেলুনের ব্যবহার: খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম কিংবা ওষুধে স্থূলতা না কমলে গ্যাস্ট্রিক বেলুন (gastric balloon) ব্যবহার করে ওজন কমানো যায়।

৫। ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি: স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ফলপ্রসু চিকিৎসা হলো ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি (bariatric surgery) যার মাধ্যমে দেহ হতে সঞ্চিত চর্বি অপসারণ করা যায়। 40 kg/m^2 কিংবা এর বেশি BMI সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির পরামর্শ দেয়া হয়। স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিষয়ক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেরিয়াট্রিকস (Bariatrics) নামে একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

৬। চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার: উচ্চ চর্বিযুক্ত দুগ্ধ জাতীয় চিজ ও বাটার, ফাস্টফুড এবং কোল্ড ড্রিংস পরিহার করে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

৭। ফল ও সব্জি আহার: প্রধান খাবার গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষুধা লাগলে ফল ও ফলের জুস খেতে হবে। সবুজ সালাদ একদিকে যেমন ক্ষুধা মেটায় অন্যদিকে দেহের ওজন কমায়। স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিনের খাবারে প্রচুর পরিমাণ সবুজ সব্জি ও ফলমূল যোগ করতে হবে।

৮। চিনিযুক্ত খাবার পরিহার: চিনিযুক্ত খাবার যেমন-মিষ্টি, চা, কফি, চকোলেট, পুডিং, ড্রিংস, কেক ইত্যাদি পরিহার করা উচিত। কেননা এসব খাদ্য শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি যোগায় এবং স্থূলতা বৃদ্ধি করে।

৯। সঠিক বিনোদন: বাচ্চাদের টেলিভিশন দেখা, ভিডিও গেম, ফেসবুক, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিনোদনে উৎসাহিত না করে তাদের নিয়ে মাঠে খেলতে যাওয়া, পার্কে ঘোরাঘুরি করা, রাস্তায় হাটা, বাসার ছাদে বেড়ানো ইত্যাদি কাজে উৎসাহ দিলে স্থূলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০। মনের ইচ্ছা ও সচেতনতা: দেহের ওজন কমানোর জন্য মনের ইচ্ছাটাকে দৃঢ়ভাবে মনে প্রাণে ধারণ করতে হবে। স্থূলতা অনেক রোগের কারণ-এব্যাপারেও সবাইকে সচেতন হতে হবে।

১১। সুষম খাদ্য তালিকা: প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত মুটিয়ে যাওয়ার মাত্রা নির্ণয় করে বয়সানুসারে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

১২। কিটোজেনিক ডায়েট: নিম্ন শর্করা ও উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবারকে কিটোজেনিক ডায়েট বলে। বর্তমনে চিকিৎসকগণ স্থূলতা নিয়ন্ত্রণে এধরনের ডায়েট গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

১৩। সরল জীবন যাপন করা: সরল ও সুখী জীবন যাপন, ধুমপান পরিত্যাগ করা, দৃঢ় মনোবলের অধিকারি হওয়া, সর্বদা সৃজনশীল চিন্তা করা ইত্যাদি কাজ মানুষকে ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারি করে এবং স্থূলতা থেকে রক্ষা করে।